সচিত্র নূতন সংস্করণ

কিশোরী

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রীতি-উপহার
এ, আর, বানার্জি
কলিকাতা
কলেজ ষ্ট্রীট
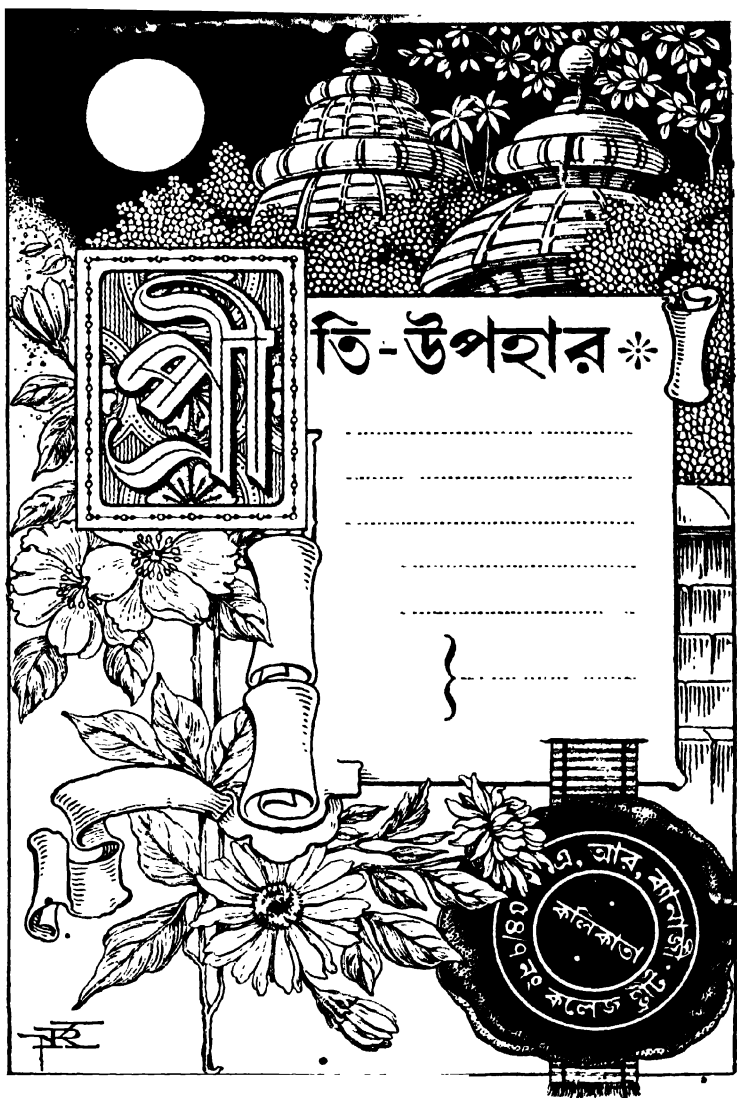
প্রথম পরিচ্ছেদ

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে.....

নিশীথ—অন্ধতমসী যামিনীর বুক চিরিয়া আর্ত্তনাদ শোনা গেল—"মাগো! আমার যে আর কেউ রইলো না মা! কার কাছে আমায় রেখে গেলে আজ? আমি কোথায় যাবো—কেমন ক'রে থাক্‌বো—কি খাবো—যাবার সময় বোলে দিয়ে যাও মা!"

কিন্তু মায়ের আর সাড়া দেওয়ার শক্তি ছিল না তখন। এ-দুনিয়ার দেনা-পাওনা চুকাইয়া, তিনি তখন পর-দুনিয়ার উদ্দেশে পা-বাড়াইয়া দিয়াছেন।

সেদিন ছিল ভাদ্রের ভরা বাদরের রাত্রি। তুফানে তুফানে পৃথিবীর বুকখানা ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া গেছে,—রাস্তা ঘাট জলে জলে ছয়লাপ্‌! ক্ষুদ্র পল্লীর অধিবাসীদের চোখে ঘুম নাই,—দুরন্ত মেঘের গর্জ্জন আর অশান্ত ঝড়ের স্বেচ্ছাচারীতা—মনে আতঙ্ক জাগাইতেছিল।

জীর্ণ এই কুটীরের জরাজীর্ণ মরণ-পথযাত্রী নারীর আসন্ন যাত্রাকালের খবর অনেকেই জানিত।...কিশোরীর মর্ম্মন্তুদ্‌ আর্ত্তনাদ যে, শুনিল—সেই ছুটিয়া আসিল।

কিশোরী বয়সেও কিশোরী, নামেও কিশোরী; ব্রাহ্মণ-কন্যা। সংসারে থাকার মত ছিলেন—মা।—তাঁর যাওয়ার পরও—এখনো এমন একজন আছেন, যাঁর নাম করিলে অপরিচিতের দল একবাক্যে কিশোরীকে

অনাথা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি হইবে না। কিন্তু পরিচিত গ্রামবাসীরা স্বীকার করিলই যে, কিশোরী মাতার মৃত্যুর পর সত্য-সত্যই আজ অনাথা হইয়া গেছে।—কেননা পিতা বর্ত্তমান থাকিতে ও তিনি একটি মাত্র কন্যার খোঁজ লইতে আসিবেন না—ইহা কতকটা চন্দ্র-সূর্য্য-উদয়াস্তের মতই সত্য কথা। অভাগিনী সতী, পতির আচরণে জীবনভর বহু জ্বালা ভোগ করিয়াছে, তবু স্বামীকে দোষ দিতে চাহে নাই। সে বুঝিয়াছিল,—সমস্ত জীবনের মর্ম্ম-ছেঁড়া দুঃখের বিজয় নিশান তলে দাঁড়ায়াই, সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল—দোষ তার পোড়া কপালের!—স্বামী সুখে দুঃখে দেবতা—সতীর পরমগুরু।...

কিশোরী মায়ের মরা দেহের বুকে মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। প্রতি-বেশী গয়লা বউ ডাকিল—দিদি ঠাক্‌রুণ! আর কেন? এইবার মেয়ের কাজ করো!...মা কি কারুর চিরদিন বেঁচে থাকে ভাই?

কিশোরী মুখ তুলিল। জবাফুলের মত রাঙা সে মুখ। স্ফীত নয়নের কোণ্ বহিয়া বাদলধারার মতই অশ্রুধারা গড়াইতেছে!—গণ্ড দুটী তাই সিক্ত!

কিশোরী কহিল—আমার মত এমন সর্ব্বনাশের মাঝে বসিয়ে দিয়ে ক'জনের মা পালিয়ে যায় গয়লা বউ?—ওরে আমার যে ত্রিসংসারে কেউ রইলো না আর।...আমি যে......আর বলা হইল না। গভীর শোকের উচ্ছ্বাস—বাক্‌শক্তিকে হরণ করিয়া লইল।

একটি একটি করিয়া গৃহে তখন পাঁচ সাতটি স্ত্রী-পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। সকলের মুখে বেদনার চিহ্ন—সহানুভূতি ও সান্ত্বনার কথা।

গয়লা বউ, জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে, কিশোরীর গলা জড়াইয়া

নিজেও হয়তো রোদন করিতে বসিত। সুখে দুঃখে তাহারা ছিল—ভিন্ন দেহে একমন। কিশোরীকে ক্রমশঃই অস্থির হইতে দেখিয়া সে কহিল—দিদি ঠাকৃরুণ, ছোড়্দাকে অনেকক্ষণ পাঠিয়েচি,—সহরে থেকে ফিরে আস্‌তে তার খুব বেশী দেরী হবে না। যাবে আর খুড়ো ঠাকুরকে নিয়েই চ'লে আস্‌বে।

সমাগত লোক কয়জনের একজন বলিল—আর খুড়ো ঠাকুর......খুড়োঠাকুর যদি মানুষের মত হবে, তাহলে এই দুধের বাছার কপালে এমন বিপদ ঘটে!...অমানুষ ছোটলোক—কাঁহাকার!

গভীর শোকের মধ্যেও কিশোরীর মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল।—কহিল—তোমরা বাবাকে দোষ দিয়ো না। মা আমার দুদিন অন্তর একবেলা খেয়েচে, জল খেয়ে পেট ভরিয়েচে তবু ভুলেও কপালের দোষ ছাড়া কারুর দোষ দেয়নি।...বাবা কি করবেন?—আমাদের অদৃষ্ট মন্দ!

গয়লাবউ ক্রমেই অতিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছিল। কিশোরীর বাপের কাছে যাহাকে সে পাঠাইয়াছে, সে তার দাদা—নন্দলাল। সংসারে আপন জন এই বোন্‌টি ছাড়া আর কেউ না থাকায়, তাহার স্বামী-বিয়োগের পরই অভিভাবকত্ব লইয়া এগ্রামে বসবাস করে।

নন্দলালের সহর হইতে ফিরিয়া আসিতে অনেকখানি বিলম্ব হইল। রাত্রি তখন ভোর। বর্ষণ-ধারা সহিয়া অতি অবসন্ন পক্ষীকুল কচিৎ কখনো ডাকিয়া উঠিতেছিল। শন্ শন্ বাতাসের শব্দে সে স্বরও সকল সময় শোনা যায় না।

নন্দলালকে আসিতে দেখিয়াই ব্যগ্রকণ্ঠে গয়লা বউ জিজ্ঞাসা করিল—খুড়োঠাকুর আসচেন?...তুমি একলা এলে যে?

নন্দলাল ছিল — নাবালক গয়লা। অর্থাৎ বাট্ বৎসর পূর্ণ হইতে এখনো তার ঢের বাকী। ভগিনীর প্রশ্নে উত্তর দিল সে নাবালকের মতই। কহিল—দূঃ তোর খুড়োঠাকুর! বামুন না হলে ব্যাটা ছোট—

গয়লাবউ মাঝখানে বলিয়া উঠিল—মুখ সাম্‌লে, ভাল করে কথা কও ছোড়দা!...লোকে বলবে কি?

নন্দলাল রাগে রাগেই বলিল— যা বলে বলুক। তবু তোর খুড়ো-ঠাকুরকে যা বলে, ততটা বল্‌তে পারবে না। উঃ বামুন হয়ে এত বড় শয়তান......

কিশোরী বলিল—আমার কাছে আর বেশী কিছু ব'লোনা নন্-দা, হাজার হোক—বাপ্। আমি শুন্‌তে পারবো না।

নন্দলাল বলিল—মুখ বুজে স'য়ে স'য়েই তো অমন ধারা নীচে প'ড়ে গেছ! নইলে পাওনা গণ্ডা আদায় করলে—বাপের সাধ্যি কি যে তা না দিয়ে থাক্‌তে পারে!...বেশী আল্‌গা দিলে অরে সহজে আট্‌কানো চলে না দিদি!...মা-ঝি দুটিতেই তোমরা পয়লা নম্বরের বোকা। কিন্তু সে সব কথা থাক, এখন মা-ঠাক্‌রুণকে ঘাটে নিয়ে যাবে কে?—বামুন-দের একজনকেও দেখছি নে তো।...আর এই হারামজাদা দেব্‌তার আক্কেল দেখ না।...এক দণ্ডও যদি থেমে থাকে।...ঝমাঝম্ ঝমাঝম্ বিরাম নেই।...

গয়লা বউ কহিল—একজন দিচ্ছে কপালের দোষ, তুমি দিচ্ছ—দেবতার দোষ—এইবার আমি যদি তোমাদের দুজনকার বুদ্ধির দোষ দিই, তা হ'লেই তো সব গোল চুকে যায়। হাতে কাজ কর—তারপর

দোষীকে দোষ দিয়ো নন্‌-দা! দুর্ব্বলের বল নেই ব'লে ভগবানকে অপরাধী করা চলে না, অপরাধ তার নিজেরই হয়তো। কিন্তু রাত ভোর হ'য়ে এলো, লোকজন ডাকো। খুড়ীমাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে।

নন্দলাল কহিল—দিদি ঠাক্‌রুণের আপন জন কি এই মা-টি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই?...সহরে যাবার আগে তো বাড়ীভরা লোক দেখে গেলাম—তারা সব গেল কোন্‌ চুলোয়?...কি বল্‌বো—এই পাজী ছোট লোকের গাঁ থানাই বদ্‌।...আমার সাফ্‌ কথা! ও সব বাম্‌নাই চাল আমি বুঝ্‌তে শিখিনি দিদিঠাক্‌রুণ! আমার রাগ বড় খারাপ। এই চল্‌লাম,—ফি জনের বাড়ী বাড়ী একবার ছেড়ে দশবার করে ডাক দেব, খোসামুদীর চরম করবো, যদি কেউ না আসে—

গয়লা বউ বলিয়া উঠিল—কিন্তু আস্‌বে না-ই বা কেন? আগে দেখ—কে আসে আর কে না আসে—

নন্দলাল ঈষৎ বিরক্তির সুরে কহিল—আমি কি দেখ্‌বো না বলছি না কি?...কিন্তু না এলে, সব ব্যাটার টিকি ধরে টান্‌তে টান্‌তে হাজির করবো। আমার বাবা সাফ্‌ কথা।

গয়লাবউ বিশেষ কিছু বলিল না। এই অতি মাত্রায় একরোখা দাদাটির আসল স্বভাব সে ভাল রকমই জানিত।

কিন্তু কিশোরী এতক্ষণ যে কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, এইবার সেই কথাই উত্থাপন করিল। কহিল—বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল না নন্‌ দা?

নন্দলালের উষ্ণ মেজাজ উষ্ণতর হইয়া উঠিল। বলিল—শুধু দেখা নয় দিদি! বে-আক্কেলে বামুনের পা ধরে কেঁদেছি,—পায়ের জুতো

খোকাটা হেঁহর ছেলে হ'য়েও চেটে চেটে ভিজিয়ে দিয়ে এসেচি, তবু তার ফুরসৎ হ'ল না। ব'ললে—'আমার এখানেও বিষম কাণ্ড বেধে গেছে। বাতের ব্যাথায় সৈরভি তিনদিন কাল বিছানা ছেড়ে ওঠেনি—তাকে ফেলে যাই কেমন করে'...উঃ কি ব'ল্‌বো—দিদিঠাক্‌রুণ! তোমার বাপ ব'লেই বাম্‌না আজ বেঁচে গেল, নইলে গয়লার হাতের এক ঘুষীতে চোদ্দ পুরুষকে যমপুরী পাঠিয়ে আস্‌তাম।...সৈরভীর বাতের বেদ্‌না!... সৈরভী ওর সাত অন্ধকার সাতপাকের পরিবার।

রাগিয়া গেলে নন্দলাল কাহারও তোয়াক্কা রাখে না,—এটুকু শুধু গয়লা বউ কেন,—তাহার পরিচিত মাত্রেই জানিত এবং বিশ্বাসও করিত, আর সেই বিশ্বাসটুকু ছিল বলিয়াই ভয় ছিল—সকল চিন্তার পুরোভাগে। গয়লা বউ ঈষৎ চড়া সুরে বলিল—খালি খালি বক্‌লে তো কাজ হবে না ছোড়দা! যদি উপায় করে দিয়ে বকাবকি সুরু করো, বরং তা মানান্‌সই হয়। নইলে পচা আদার ঝাল বেশী—এ কথাটা ছুনিয়া শুদ্ধ লোকই জানে।

হাতের লাঠিখানা বার দুই মাটীতে ঠুকিয়া নন্দলাল রক্ত চক্ষুতে কিশোরীর পানে চাহিয়া বলিল—পাপ পুণ্যির সঙ্গে আমার জানাশুনা নেই দিদি! আমি জানি—সিধে রাস্তা। কাঁটা খোঁচাকেও গেরাহ্যি করিনে। শেষটায় যেন দোষ দিয়ে ব'সোনা। বলিয়াই আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা করিল না, সেই অশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

কিশোরী শঙ্কিত হইয়া বলিল—রাগের মাথায় উল্টো না ক'রে বসে!

কিশোরীর—সন্ধ্যা-বন্দনা।
"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।"

গয়লা বউ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। কিশোরীর কথার জবাব দিল না।......

তখন প্রাতঃকাল হইয়া গেছে। বর্ষণরত মেঘের পুরু আবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রকাশিত হওয়ার কোন লক্ষণ না দেখা গেলেও, দিবসারম্ভের সূচনা বোঝা যাইতেছিল।

গয়লা বউ কহিল—কারুর সঙ্গেই তো দেখা সাক্ষাৎ নেই! কি হবে দিদি ঠাক্‌রুণ?...

কিশোরী মাতার মৃত্যু-মলিন মুখখানার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া নীরবে অশ্রু ফেলিতে লাগিল। আজ আর অনুযোগ করিবার মত কেউ নাই তার।—এ বিশ্ব সংসারের সকল দাবী-দাওয়া যেন মরনের দুন্দুভিতেই নিঃশেষে বিসর্জ্জিত হইয়া গেছে আজ!

একই সঙ্গে তিনজন বাড়ী ঢুকিলেন,—সকলেই কিশোরীর প্রতিবেশী—স্বজাতি।

চোখের জলেই কিশোরী সকলকে অভ্যর্থনা করিল।

এম্‌নি সময় আরো দুইজনের দুখানা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে নন্দলাল বাড়ীতে ঢুকিতেছিল।

গয়লা বউ চীৎকার করিয়া উঠিল—হাত ছাড়ো—হাত ছাড়ো! বামুন যে ওঁরা! পাপ হবে!

রুষ্টস্বরে নন্দলাল বলিয়া উঠিল—চোপ্‌রাও!...নন্দ গয়লা পাপ-পুণ্যির ধার ধারে না। ওঃ বামুন!......বামুন বুঝি 'গায়ে আঁকা থাকে বটে?......তারপর সমাগত লোকগুলিকে সম্বোধন করিয়া কহিল—নাও না গো! নবাবের মতন দাঁড়িয়ে থাক্‌বার জন্যে

তো তোমাদের পায়ে ধরতে যাই নি!...শ্মশানঘাটে মড়া নিয়ে যেতে হবে।

একজন কহিল—আমাদের কাজ, আমরা যখন হয় করতামই। কিন্তু তুই ব্যাটা গয়লার পো—বামুনের গায়ে হাত দিলি কি হিসেবে?

নন্দলাল তীব্রতেজে বলিয়া উঠিল—হিসেব নিকেস পরে কোরো ঠাকুর! কাজ করতে দেরী হ'লে একবার কেন হাজার বার হাত-পা ধরে টানাটানি করবো!...তোমাদের কাজ তোমরা করবে—সে তো জানিই, কিন্তু সে কখন? মড়াটাকে পচিয়ে গন্ধ বের করে? বলি তোমারা তো আর মাকণ্ড হয়ে জন্মাওনি ঠাকুর! যে, মরবে আর বেঁচে উঠ্‌বে! ও সব জোট পাকানো চাল নিজের বাড়ী বসে চালিয়ো।

ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের দল একই কণ্ঠে বলিল—তুই ব্যাটা হাত ধরলি কোন্ সাহসে?

নন্দলাল হাসিয়া উঠিল। বলিল—যে সাহসে হাত ধরেছি, তার আঠারো গুণ ভয়ে ভয়ে পা ধরচি বাবাঠাকুর! বাক্-চাতুরী বাকী রেখে, আবাগী মেয়েটাকে বাঁচাও! মা ছাড়া তার কেউ নেই, আজ দয়া করে সেই মাকেই শেষ করে এসো তোমরা।

একজন বলিল—তোকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। জানিস—হতভাগা ছোট লোক,—সিধু চক্রবর্ত্তী দশখানা গাঁয়ের পুরুত?...ছশো যজ্‌মান দিনরাত্তির তার পায়ের গোড়ায় মাথা নোয়ায়? জানিস—ত্রিসন্ধ্যা না করে সে জলগ্রহণ করে না?...ব্যাটা ছুঁচো বেইমান!

নন্দলাল হঠাৎ অত্যন্ত বিনীত হইয়া পড়িল। হাতের লাঠিখানা

বগলে দাবিয়া, করযোড়ে বলিল—আমি সব জানি বাবাঠাকুর!...কিন্তু দোহাই তোমার!—নিজের দুঃখু নিজেই ডেকে এনো না। নন্দ গয়লার এখনো বাট্ বছরে ঢের বাকী। নাবালক অবস্থায় একটা অঘটন কিছু ঘটিয়ে বস্‌লে, সাবালকের দল কেউ তাকে দোষ দিতে পারবে না।... আজ পাকা বারোটি মাস তোমাদের পায় তলায় বাস করছি, গাঁয়ের লোক হ'য়ে তোমরা কি টের পাওনি, যে, রাগ্‌লে আমি কারুর বাপের খাতির রাখিনে। পষ্ট কথায় জবাব দাও—যার জন্যে ডাক্‌লাম—

একজন বলিল—ও ব্যাটা ভেমো গয়লার কথায় কান দিয়ো না হে! চলো হাতাহাতি কাজ শেষ করি।

অপর এক ব্যক্তি বলিল—কিন্তু বিষ্টিটা না থাম্‌লে কি করে যাওয়া যায়?

নন্দলাল বলিয়া বসিল—মড়া ঘাড়ে নিয়ে কেউ হাতীর কাঁধে চাপ্‌তে যায় না ঠাকুর!...ও সব ন্যাকাপনা নিজের বাড়ী বসে দেখিয়ো।

লোকটি বলিল—বেইমানী করিসনি নন্দ! আমরা এসেচি তো? না আসিনি?...ফের যদি গোঁয়া-র্তুমি করো, পুলিশে ধরিয়ে দেব।

নন্দলাল নতজানু হইয়া কহিল—মরণ ডেকোনা ঠাকুর! পায়ে পড়চি তোমাদের। পুলিশে কেন,—যেখানে হয় দিয়ো, আগে খুড়ী-ঠাক্‌রুণের সদ্‌গতি করে এসো।......

...যথারীতি শব লইয়া সকলে শ্মশানে চলিয়া গেলে, নন্দলাল গৃহ দ্বারে চাবি লাগাইয়া রওনা হইবার উপক্রম করিতেছে, এমনি সময় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া বলিল—ঘরের চাবি দাও!

নন্দলাল তো মহা বিস্মিত! কহিল—বাঙলা করে বলুন মশায়!... আমরা জাত গয়লা, বোকা মুরুখ্যু মানুষ, ইংরাজীর সঙ্গে জানা শোনা নেই।

ভদ্রলোকটী কহিল—আমি সহর থেকে আস্‌চি। পশুপতি চাটুয্যে আমায় পাঠালেন।

নন্দলাল কহিল—পশুপতি আবার কে?

—কিশোরীর বাপ।

—ও, তা বেশ তো,—পাঠালেন বেশ করলেন। কিন্তু আদর-সোহাগ করবার তো এখন ফুরসৎ নেই।......বাড়ীতে বিপদ হ'য়েচে, কিশোরী এখন শ্মশানঘাটে।

—তা জানি। চাটুয্যে আমায় ব'লে দিয়েছেন, ঘরের জিনিস পত্র সমেত কিশোরীকে তাঁর ওখানে নিয়ে যেতে।

নন্দলাল এখন আর রাগ করিল না। কৌতুকের সুরে বলিল—তাঁর ওখানে, মানে—সৈরভীর বাড়ীতে?

ভদ্রলোক কহিল—তাতেই বা দোষ কি?

নন্দলাল হাতের লাঠিখানা খাড়া করিয়া বলিল—মাথার ঘি বের ক'রে, দেশ্‌লাইয়ের কাঠি জ্বেলে পোড়াবো।......মানে মানে পথ দেখুন মশায়! আমার নাম জানেন?—নন্দ গয়লা।......গাঁয়ের লোক ঘণ্টায় ঘণ্টায় থানা পুলিশের ভয় দেখায়।

লোকটি যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াই বলিল—কিন্তু মিথ্যে ভয়ে তো আমি ভুল্‌বো না বাপু! পশুপতি বাবুর মেয়ের সঙ্গেই আমার কথা হবে, তুমি কেন মাঝখানে থেকে কথা বাড়াচ্ছো?

চীৎকার করিয়া নন্দলাল বলিল—মাঝখানে নয়, আমি সবার আগে রয়েচি।...যাও তোমার বাবুমশায়কে বলগে—কিশোরী দিদি নিজের রক্ত শেয়াল-কুকুরকে খাওয়াবে, তবু সৈরভীর বাড়ীতে পা দেবে না।...নেমকহারাম বাপের মাস্তি দেখানো,...সে কিশোরী দিদির কুষ্টিতে লেখা নেই।...যাও বিদেয় হও!

লোকটি বলিল—কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি,—পশুপতি বাবুর মেয়ের সঙ্গেই আমার কথা হবে।

—সে যখন হবে তখন হবে।—এখন তো সরে পড়ো; আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।...বরং দরকার বোঝো তো—আমার সঙ্গে শ্মশান-ঘাটে চলো।

—"আমার দায় প'ড়েচে" বলিয়া লোকটি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পড়িল।

নন্দলাল খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আর রাগ সাম্লাইতে পারিল না। আগন্তুক ভদ্রলোকের ঘাড়ে ধরিয়া টানিতে টানিতে বাড়ীর বাহিরে আনিয়া ফেলিল।......তখন বৃষ্টির বেগ কমিয়া গেছে।

নন্দলাল আর ফিরিয়াও চাহিল না। জোরে জোরে নিজেদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ইচ্ছা—বাড়ীতে গরু-বাছুরদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া শ্মশানে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু দশ পনের মিনিট পরে, শ্মশানে যাইবার পথে পুনরায় কিশোরী-দের বাড়ীখানা হইয়া যাইবার বাসনা হওয়ায়, সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—ঘরের তালা ভাঙা এবং ভিতরে এই দুঃখী পরিবারের যে সামান্য সামান্য

বাক্স পেট্‌রা বা তৈজসাদি ছিল, তাহাও অপহৃত হইয়াছে।...অদৃষ্টের পরিহাস আর কি!......

নন্দলালের দৃঢ় ধারণা জন্মিল—কিশোরীর পিতার প্রেরিত সেই ভদ্রলোকই আজ কিশোরীকে একান্ত অনাথা জানিয়া এ হেন হীনাদপি কার্য্যে হাত দিতে সাহসী হইয়াছে।...

নন্দলাল হাতের লাঠিখানা কাঁধে ফেলিয়া, সহরের পথে পা বাড়াইয়া দিল।...আজ কন্যার প্রতি পিতার এই অকৃত্রিম স্নেহের উপযুক্ত পুরস্কার দিবার গুরুভারটা সে স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইল।......নির্ম্মম নিয়তির লীলা!......

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

...ব্রাহ্মণ ব'লে চিন্‌তে না পেরে—

ধ'রে নিয়ে যায় থানাতে।"......

কিশোরীর পিতা পশুপতি চট্টোপাধ্যায় রামপুর সহরের মাঝামাঝি, একখানা ছোট দ্বিতল বাড়ীতে বাস করেন। বয়সে প্রৌঢ় হইলে কি হয়, কর্ম্মকার-দুহিতা বিধবা সৌরভীর সহিত তাঁর এমন এক শুভ সন্ধিক্ষণে চোখোচোখি হইয়াছিল যে, সেইদিন হইতে আজ প্রায় দশ বৎসরকাল তিনি সৌরভীর সংস্পর্শ ব্যতীত একমূহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না।...... আপন পত্নী-কন্যা অনাহারের জ্বালায় গ্রামবাসীর দ্বারস্থ,—একথা বহুবার কাণে আসিয়াছে, তবু পশুপতির মোহ-ঘুম ভাঙে নাই, অথবা ভ্রমেও কোনদিন কিশোরী বা তাহার মাতার সংবাদ লইবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখান নাই। উকীলের মুহুরীগিরি করিয়া যা কিছু উপার্জ্জন হয়, সে সমস্তই সৌরভীর চরণে অর্পণ করিয়া, তাহারই আদেশ মাথায় ধরিয়া, বিনা চিন্তায়—বিনা দ্বিধায়—বিনা আড়ম্বরে—তিনি এ যাবৎ জীবনাতি-বাহিত করিতেছেন।

......নিশীথ সময়ে যখন নন্দলালের আকস্মিক কণ্ঠ হইতে পত্নীর মৃত্যু সংবাদ উচ্চারিত হইয়াছিল, অবশ্যই পশুপতি বাবু তখন সৌরভী-বাহু-বন্ধনাবস্থায় সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিলেন।......ডাক শুনিয়া জাগ্রত হইয়াই, সমস্ত শুনিলেন, কিন্তু পত্নীর ইহলোক ত্যাগের সংবাদ শ্রবণান্তর৲ জবাব

দিলেন—সৌরভীর দেহ ভাল নয়, তাকে একা রেখে আমার যাওয়া চ'ল্‌বে না।......

......প্রাতঃকাল হইতেই সৌরভী কহিল—লোক পাঠিয়েচ—মেয়েটাকে আন্‌তে?

পশুপতি কহিলেন—পাঠালাম তো, কিন্তু সে আস্‌বে কিনা জানি না।

সৌরভী কহিল—না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে তবু আস্‌বে না?...তার ঘাড় আস্‌বে।...পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

পশুপতি কহিলেন—হয়তো আসবে, নয়তো আসবে না। কিন্তু অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ কি?...বেলা হচ্ছে—আফিসের ভাত চড়বে কখন?

ঈষৎ হাসিয়া সৌরভী কহিল—বাতের ব্যাথাটা বড্ড ধরেচে, ভাত রাঁধতে আজ আমি পারবো না। কুবের ঠাকুরের হোটেলে গিয়ে খেয়ো, আর আমার জন্যে একথালা পাঠিয়ে দিয়ো।......

তাড়াতাড়ি সৌরভীর বাঁ পা খানায় হাত রাখিয়া পশুপতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন—সে কি!......বামুনের মুখের বেদ্‌বাক্যি, সত্যি সত্যি ফ'ল্‌লো না কি?...খুব ব্যাথা হ'য়েচে?...তেলটা খানিকক্ষণ মালিশ করে দেব?

সৌরভী কিছু না বলিতেই, প্রেরিত ভদ্রলোকটি ফিরিয়া আসিয়া সদরের কড়া নাড়িল।

পশুপতি দরজা খুলিলেন,—লোকটি মুটের মাথা হইতে দুইটী বাক্স নামাইয়া লইয়া বাড়ী ঢুকিল।

সৌরভী জিজ্ঞাসা করিল—এলো না?......

—না।

সৌরভী গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—ও বাবা!..: কি দেমাকে মেয়ে গো!......জিজ্ঞেস করেছিলে—না খেয়ে থাকবে ক'দ্দিন?......সেখানে তার কোন্ বাবা খাওয়াবে?

পশুপতি কহিলেন—যাকগে, মরুকগে।...জিনিষপত্র যা যা পেয়েছ নিয়ে এসেচ তো?...হাজার হোক্—পিতৃপুরুষের জিনিষ, ওসব নিজের কাছে রাখাই ভাল।...হতভাগীর কপাল মন্দ, তাই কুবুদ্ধি গজিয়েছে।

কিন্তু কথাবার্ত্তা আর একটুও অগ্রসর হইতে পারিল না। এক ধাক্কায় সদর দরজার কপাট ভাঙিয়া, রুদ্রমূর্ত্তিতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল—সে নন্দলাল! ভিতরে ঢুকিয়াই, সে সর্ব্বপ্রথমে ডান হাতে পশুপতির মাথাটা ধরিয়া, বাঁ হাতে সৌরভীর মাথা টানিয়া, উভয় মাথায় প্রবল বেগে ঠোকা-ঠুকি করিয়া দিল।

তারপর সৌরভীকে এক ধাক্কায় ঠেলিয়া দিয়া, পশুপতির গলায় অর্দ্ধ-মলিন গামছাখানা জড়াইয়া, টানিতে টানিতে বলিল—চলো মশায়!... ...আসল চোর তুমিই!......দেখি ইংরেজের রাজত্বে চোরের সাজা হয় কি হয় না।......

পশুপতির দম্ আটকাইয়া আসিতেছিল। কোন রকমে, মিনতির সুরে বলিলেন—লক্ষ্মী বাবা আমার! আগে আসল ব্যাপারটা বুঝ্তে দাও, তারপর যা খুসী কোরো।

নন্দলাল তখন ভীষণ উত্তেজিত! কথা কহিবার শক্তি নাই!...ক্রোধে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল।......

সৌরভী ধীরে ধীরে সেই ভদ্রলোকটীর সাহায্যে কিশোরীদের জিনিষ-পত্রপূর্ণ অপহৃত বাক্স দুইটী ঘরের মধ্যে সাম্লাইতে ব্যস্ত ছিল।

নন্দলাল হেঁচ্‌কা টান টানিয়া পশুপতিকে সদর রাস্তায় আনিল, তারপর গম্ভীরস্বরে বলিল—বাঁচ্‌বে, না অপঘাতে মরবে? কি সাধ হয়?...

কাঁপিতে কাঁপিতে পশুপতি কহিলেন—খোলসা করে বলো বাবা! আমি তো কিছু জানি না!

নন্দলাল ভ্রূকুটী করিয়া কহিল—গাজলপুর চেন?—যেখানে তোমার বাপ-পুরুষের বাড়ী আছে?—চেনো?...কিশোরীকে চেনো? নাম শুনেছ?...বলিয়াই অতিরিক্ত ক্রোধে পশুপতির পৃষ্ঠদেশে এক ঘুষি লাগাইয়া কহিল—উঃ—ন্যাকা ঠাকুর!...তোমার আক্কেলের মাথায়...উঃ কি আর ব'লবো,—জাত গয়লা আমি—বলবার মুখ নেই। নইলে......

সহসা পশুপতি দেখিলেন—থানার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন। জোরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—পুলিশ! পুশিল! পাহারাওলা! শীগ্‌গীর ...আমায় খুন করলে।

থানার কাছে এমনতর চীৎকার, বড় যেমন তেমন কথা নয়। এক-জনের জায়গায় পাঁচজন পাহারাওলা, এমন কি স্বয়ং দারোগা বাবু পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িলেন।

নন্দলাল সঙ্গে সঙ্গে পশুপতিকে ছাড়িয়া দিয়া, করযোড়ে কহিল—হুজুর! চোরের সাজা না দিলে, আমরা গরীব মানুষ গাঁয়ে বাস করবো কেমন কোরে?...বিশ্বাস না করেন, চলুন ওঁর বাড়ীতে,...চোরাইমাল এখনো মজুত রয়েচে।

দারোগা বাবু পশুপতিকে অবশ্যই চিনিতেন, এবং মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। সহরের অনেক ভদ্রলোকেই এইরূপ ঘৃণ্যভাব পশুপতির উপরে পোষণ করিত।

দারোগা বলিলেন—চাটুয্যে মশায়! সত্যি কথা বলুন, একটা সামান্য চাষার এমন সাহস নেই, যে মিছি মিছি আপনার গলায় গামছা জড়িয়ে টান্‌তে পারে।

পশুপতি বলিলেন—ধর্ম্ম সাক্ষী হুজুর!...এ ব্যাটা বাড়ী ঢুকে আমায় মার পিট করেছে। বলিয়াই ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

দারোগা নন্দলালের পানে ফিরিয়া কহিলেন—কিরে ব্যাটা! তোর কথা কি?

নন্দলাল দীপ্ত রোষে বলিয়া উঠিল—ব্যাটা ব্যাটা করবেন না হুজুর! দোষ করে থাকি, সাজা নেব। অপমানের কথা সইবো না।...আমার নাম নন্দ গয়লা। সোজা ছাড়া বাঁকা কথা কইনে আমি।

দারোগা ক্রুদ্ধ হইলেন না, বরং মনে মনে খুসী হইয়া কহিলেন—আচ্ছা বাবু!—ভাল কথাই বল্‌চি।......ব্যাপারটা খুলে বল দেখি?

নন্দলাল করযোড়ে কহিল—হুজুর! আপনি রাজা—আপনি মালিক!

বিচার ক'রে সাজা দেবেন।...কিন্তু তার আগে, এই ছোট লোক বামুনকে নিয়ে আমার সঙ্গে একবারটি গাজলপুরে যেতে হবে। নইলে একটা কথাও আপনার বিশ্বাস হবে না, সহরের মধ্যে যেমন তেমন সাক্ষী সাফাই দিতেও আমি পারবো না।......হুজুর! জাত গয়লা আমি, তবু বুকে হাত দিয়ে ধর্ম্ম তাকিয়ে কথা বলি।......ভদ্রলোকের পোষাক গায়ে ক'রে, ছোটলোকী ফলাতে আমরা শিখিনি।

দারোগা বাবু পশুপতিকে কহিলেন—চলুন! থানায় যেতে হবে। দশটার পর গাজলপুর রওনা হবো।

তাড়াতাড়ি পশুপতি বলিয়া উঠিলেন—আজ্ঞে সে কি করে হবে?—আমায় কাছারী যেতে হবে যে?

দারোগা বাবু ধম্‌কাইয়া উঠিলেন—তোমার কাছারী যাওয়া বের করছি দাঁড়াও!......সকল কথাই আমার জানা আছে।......দেখ বাপু, তোমার নামটা কি ব'ললে?—নন্দ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর!—নন্দলাল!—আমি জাত গয়লা।...

দারোগা কহিলেন—আচ্ছা।......কিন্তু চোরাইমাল কোথায় আছে ব'ললে? এঁর বাড়ীতে?...কি কি জিনিস?

—দুটো বাক্স, ভেতরে কি আছে জানিনে, তবে, এক বামুন-কন্তের যথা সব্বস্ব আছে—এ টুকু জোর গলায় ব'লতে পারি। বাড়ী তার গাজল পুরে।......ধর্ম্ম তাকিয়ে বিচার করতে হবে হুজুর!......খালি খালি আইন দেখালে শুন্‌বো না।

পশুপতি উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন—তাই করবেন হুজুর! ধর্ম্ম তাকিয়েই বিচার করবেন। আমি ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল জ্ঞানই আমার আছে। জিনিষপত্র যা আমার বাড়ীতে রয়েচে, তার একটিও চোরাই মাল নয়, আমার নিজস্ব, পিতৃপুরুষের জিনিষ। আমার মেয়ের হেপাজাতে ছিল। ...মেয়েটির মা নেই, নিজের কাছে নিয়ে আস্‌তে বিশ্বাসী লোক পাঠিয়েছিলাম,—এই ব্যাটা হতভাগা গয়লা তাকে খুন করে ফিরিয়ে দিয়েছে।...

হুঙ্কার দিয়া নন্দলাল বলিল—মাপ করবেন হুজুর! আপনারা মা বাপ, যদি পুলিশের বড় বাবু হয়েও দুষ্টুকে শাসন না করেন, তা হ'লে গয়লার মাথায় পোকা ঢুক্‌বে। বামুনের রক্তদর্শন শাস্তরের নিষেধ হ'তে পারে, কিন্তু নন্দ গয়লার বিধি, শাস্তরের বাবার ধার ধারে না। উনি বামুন

হ'তে পারেন, না খেতে দিয়ে আপন পরিবারকে মেরে ফেল্‌তে পারেন, কামার-কস্তের পায়ে তেল মালিশ করতে বসে, আপন কন্যাকে 'দূর ছাই' ব'লতে পারেন, ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম সব কিছুরই কদর রাখতে পারেন, কিন্তু আপন চোখে দেখে দেখে আর এই দু'কাণ দিয়ে শুনে শুনে, মুরুখ্যু গয়লারা তা বরদাস্ত করতে পারে না।

ঈষৎ হাস্য করিয়া দারোগা বাবু কহিলেন—কিন্তু এ তোমার গায়ে প'ড়ে ঝগড়া হচ্ছে নন্দলাল!......

সুযোগ পাইয়া পশুপতি বলিয়া উঠিলেন—ব্যাটা গয়লার পো'কে সেই কথাটাই ভাল করে বুঝিয়ে দিন হুজুর!...আমি ব্রাহ্মণ, আমার ধৰ্ম্মজ্ঞান নিয়ে ব্যাটা ছোট জাত গয়লার পো কথা কইতে আসে! বলুন হুজুর!—ওকে চাবুক মেরে বুঝিয়ে দিন।

অতিরিক্ত বিরক্তির সহিত দারোগা বাবু কহিলেন—সে যা দিতে হয় দেব। আপনি এখন থানায় চলুন তো!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ,
এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ"...

পাঁচদিন পরের কথা। আবার আজ বাদল নামিয়াছে। উষার মৃদু চরণক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মাতন সুর হইয়াছে—সন্ধ্যা হয় হয় তবু বিরাম নাই!

কিশোরীর ঘরের ভগ্ন চাল বাহিয়া বৃষ্টির ধারা নামিতেছে, ঘরের মধ্যে এতটুকু স্থান নাই, যেখানে বসিয়া সে, তার সর্ব্ব বিষয়ে বিপর্য্যস্ত মস্তকটাকে বৃষ্টির অত্যাচার হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারে।...হা রে অভিশপ্ত ভাগ্য! হা রে—সকল রকমে কাঙাল—করুণা-প্রত্যাশী অন্তর!

মধ্যাহ্ন আহার শেষ করিয়াই, গয়লা বউ কিশোরীর বাড়ীতে আসিয়াছে। এম্‌নি সে রোজই আসে।

দুই সখীতে অনেক সুখ-দুঃখের কথা হইতেছিল। কিন্তু সুখের কিছুই ছিলনা,—সবটুকুই মর্ম্মব্যথায় গাঁথা!

গয়লা বউ কহিল—খুড়োঠাকুরের সাজা হ'য়েচে দিদি ঠাক্‌রুণ!

কিশোরী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল—ও কথা আর আমায় শোনাস্‌নি গয়লা-বউ!—বাপের সাজা হ'য়েচে শুনে, কোন্ মেয়ে সুখী হয়? আমি না খেয়ে মরি, সে-ও আমার মঙ্গল, কিন্তু বাবার পায়ে যেন কাঁটা না ফোটে—জীবনে এইটুকুই আমি চেয়ে আসচি।

গয়লাবউ কহিল—তোমাকে তো আজ নতুন দেখ্‌ছিনে দিদি ঠাক্‌রুণ! তোমার মনের খবর আমি যেমন জানি, তেমন ক'টা লোকে জানে?...কিন্তু সাজার মজাটা তো জানোনি?

কৌতূহলী হইয়া কিশোরী চাহিতেই, গয়লাবউ বলিল—থানার দারোগাবাবু সেদিন এখানে এসে, সব দেখে শুনে গেল তো?...কিন্তু গিয়ে হুকুম দিয়েছে—খুড়োঠাকুর যদি আদর করে তোমাকে নিজের কাছে না নিয়ে যান, কিম্বা এখানে ভাল ভাবে থাকবার ব্যবস্থা করে না দেন, তা হ'লে যেমন করে হোক্ তাঁকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা হবে। ...ছোড়দা ব'ললে—খুড়োঠাকুর রাজী হ'য়েচেন।...কিন্তু তুমি চ'লে গেলে, আমরা কেমন করে থাকবো দিদি?...সংসারে এসেছিলাম—পোড়া কপাল নিয়ে,—দুখের মধ্যে তুমিই শুধু ভাল কথা ক'য়ে মনটাকে তাজা ক'রে রাখো। আর তো কেউ তা পারে না ভাই!

অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিয়া কিশোরী বলিল—তুই কি ক্ষেপে গেলি না কি? বাবাও নিতে এসেচেন, আমারও খাওয়া পরার দুঃখু গেছে, আর তোদেরও মনের কথা বল্‌বার লোকের বনবাস হয়েচে!...হুঃ—এ-ও কি একটা কথার কথা গয়লা বউ!...ডাইনীর মায়া কাটিয়ে, বাবা আমাকে চরণে ঠাঁই দেবেন!...হা রে কপাল!

গয়লাবউ কহিল—না দিদিঠাক্‌রুণ!—এর আর এদিক ওদিক হবে না। পুলিশের হুকুম, না মান্‌লে সত্যি সত্যি জেল হবে।...তা হোক্—আমাদের ভাগ্যে কষ্ট থাকে থাক্,—তবু তুমি তো সুখে থাকবে। একখানি কাপড়, সাত জায়গায় সাত তালি এঁটে, পরণে শুকিয়ে পরচো,—চালের ক্ষুদ্‌গুঁড়ো নুন্ দিয়ে ফুটিয়ে খাচ্ছ, এর চেয়ে মন্দ অবস্থা

মানুষের কত বেশী হয় আমার তা জানা নেই। কিন্তু পায়ে পড়ি দিদি-ঠাকৃরুণ! আমাকে আর 'পর' করে রেখোনা, তোমার আশীর্ব্বাদে ছ'মুঠো ভাতের আধার তো আমাদের আছে ভাই!...বামুন-কন্তের ঠোঁটের আহার যোগানো, সে যে ছ'শ বার জগবন্ধুর মুখ দর্শনের চেয়েও বেশী পুণ্য!...আমাকে তা থেকে বঞ্চিত ক'রোনা দিদি!...ক্ষুদগুঁড়ো খাবে তুমি কি ছঃখে? আমি চল্লিশটে গাই গরুর ছুধ বিক্রি করি, সহরের দশখানা দোকানে ক্ষীর ছানার যোগান্ দিই, আমার অভাব কিসের?...দিদি হ'য়ে, বোন্‌কে ত্যাগ করবে দিদি?

কিশোরীর আঁখি কোণ্ অশ্রুভারে ভরিয়া গেছে!—কণ্ঠ সহানুভূতির ভরে শক্তিহারা হইয়াছে! সত্যই তো, অকূল সংসারের দুস্তর পাথারে তৃণখণ্ড বলিতেও যখন কেউ ছিল না,—তখন তো এই অতি আপন করা আপন জনটিই তার পাশে পাশে থাকিয়া, সকল জ্বালাকে শান্তির প্রলেপে প্রশমিত করিয়া দিয়াছিল!...কিন্তু তবু এখনো সে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই,—আজও নিজস্ব ক্ষুদগুঁড়োর সাহায্যই তাহাকে জীবনধারণের উপায় করিয়া দেয়। যতই থাক্, তবুও বিধবার সম্বল! গয়লা বউ যে স্বামীহারা বালবিধবা!—সারা জীবনটাই যে সুখদুঃখে মাখামাখি হইয়া তাহার সম্মুখে! সবল হইয়া দুর্ব্বলের সম্বলকে কেন সে ভরসার চক্ষুতে চাহিবে?

কিশোরী কহিল—দরকারের সময় আমি তোর কাছছাড়া আর কারুর কাছে হাত পাতবোনা গয়লাবউ! এ তুই ঠিক ভেবে রাখিস।... কিন্তু রাত হ'য়ে এলো। বিষ্টির আর বিরাম হবে না ভাই, চল্ তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

গয়লাবউ কহিল—আমি এখন যাবো না।.. ...বলিয়াই ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে কহিল—প্রদীপটা কোথায় জ্বালো না দিদি-ঠাকুরুণ!...তোমার গামছাখানা সেলাই করে দিই।

কিশোরী মাথা নীচু করিয়া জবাব দিল—আলো আমার চোখে সয়না ভাই! আজকাল আঁধারই বেশী পছন্দ করি।

ম্লান হাসি হাসিয়া গয়লাবউ কহিল—চোখের জলটলগুলো বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে মুছে ফেলা চলে—না?—আলো থাক্‌লে ধরা পড়তে হয় কেমন?...সে আমি শুন্‌বো না, বলো—কোথায় রেখেচ প্রদীপ?

অত্যন্ত সহজ সুরে কিশোরী বলিল—তাতে তেল নেই গয়লাবউ!... জলে ঘর সংসার ভেসে যায়, কিন্তু আলো জ্বলে না।

গয়লাবউ কহিল—এম্‌নি করেই বুঝি শোধ নিতে হয়? কিন্তু ব'লতে পারো দিদিঠাকুরুণ!—আমি কী মহাপাপ করেছি?......দোষ না দেখে, বিনি দোষে সাজা দিলে তার ফলটুকুও ভোগ করতে হয়।...পোড়া বরাত আমার!...বারো মাস ঘির প্রদীপ আমি এই ঘরে জ্বেলে রাখতে পারি—সমস্ত রাত ধরে!—এমন শক্তিও আছে আমার।...গাজলপুরের গয়লা-পাড়ায় চল্লিশটে গাইগরু ক'জনের আছে?

হঠাৎ মচ্‌মচ্‌ শব্দ পাইয়া, কিশোরী ঊর্দ্ধে চাহিল। গয়লাবউ কহিল—কি হ'ল?

—চালে কিসের শব্দ হ'ল না?...ধ'সে পড়বে না কি?

গয়লাবউ কহিল—ছোড়দাকে বলেছিলাম, চারটিখানি খড় চাপিয়ে দিচ্ছে। না দিলেই ভেঙে পড়বার ভয় আছে।

কিশোরী কথা কহিল না। অতি নীরবে এই মহাদান ও মহদুপকার

সে কৃতজ্ঞতার সহিত অন্তরে গ্রহণ করিল।...না করিলে বুঝি কোন মতেই আর চলেনা আজ!......

নন্দলাল চালে খড় চাপাইয়া কখন্ চলিয়া গেছে—গয়লাবউ বা কিশোরী টের পায় নাই। কিশোরীর অতিরিক্ত পিতৃভক্তিটা নন্দলাল আজকাল একটুও পছন্দ করিত না, এবং সেই জন্যই তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া একরূপ বন্ধ করিয়াই রাখিয়াছিল।...যে বাপ, বাপ হইয়া কন্যাকে মিথ্যা দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পুলিশের হাঙ্গামায় ফেলিতে পারে, সেই রাক্ষস পিতার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন—স্থূলবুদ্ধি নন্দলালের মনে ক্রোধের উদ্রেক করিয়া দিত।

...রাত্রি প্রায় দশটা, তখনও গয়লাবউ উঠিবার নাম করে না। কিশোরী কহিল—আজ তোর হ'ল কি রে? ঘরবাড়ী সব বানের জলে ভাসিয়ে দিবি না কি?...খাওয়া দাওয়ার কথাটাও মনে নেই বুঝি?

গয়লাবউ উত্তর করিল—তোমার সঙ্গে আমার ঠাট্টা-তামাসার সম্বন্ধ পাতানো নেই দিদিঠাকৃরুণ!...নিজের খাওয়ার সঙ্গে খোঁজ নেই, পরের খাওয়ার তাগাদা, তাতে পাপ বই পুণ্যি নেই ভাই! হিসেব দাও দেখি, ও বেলাতে কি খেয়েচ, আর এ বেলাতেই বা কি খাবে?...আমি তো বিধবা, একবেলা খাই। দু'একদিন উপোস করেও থাক্‌তে জানি।

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কিশোরী বলিল—ভগবান যার উপোসের ব্যবস্থা করে রেখেচেন, তার চেয়ে ভাল জানা আর কেউ জান্‌তে পারে না গয়লাবউ! কপালের লেখা রদ্ করতে পারে,—তেমন বাহাদুর মানুষ দুনিয়ায় কজন আছে—তার ফর্দ্দ দিতে পারিস? সইতে আর কাঁদ্‌তেই যার জন্ম, তাকে সুখের রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার সাধ, সে নিতান্তই অসাধ

গয়লাবউ! আমার ভাগ্যে যা আছে, তা কি তুই ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবি ?...তুই বাড়ী যা দিদি! ..

গয়লাবউ চোখের জল মুছিয়া বলিল—আমি গেলে তুমি করবে কি ? ...বসে বসে কাঁদ্‌বে তো ?

কিশোরীর মুখখানা ম্লান হাসির মলিন আভায় ছাইয়া গেল। গয়লাবউএর গলা জড়াইয়া বলিল—দুঃখীর অতবড় সুখের সাথী আর বিশ্বভুবনে কোথাও মিল্‌বে না দিদি! সত্যি সত্যিই আমি কাঁদবো। নইলে বাঁচবো কেমন করে ? বলিয়াই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তারপর আপন মনেই বলিল—তবু বাঁচ্‌বার আশা! অথচ আশা-তরুর মূলটুকু অবধি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে!

গয়লাবউ কহিল—আমি চ'ললাম, কিন্তু এক্ষুনি একবাটী দুধ আর ছানা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছোড়্‌দা ব'সে থেকে খাইয়ে যাবে। যদি না খাও, কাল থেকে গয়লাবউ আর এমুখো পা বাড়াবে না।...তারপর হঠাৎ হাত দুখানা যোড় করিয়া বলিল—আমার মাথার দিব্যি রইলো ভাই! ...এতে দোষ নেই কিছু।

কুণ্ঠিত হইয়া কিশোরী বলিল—আমার ক্ষিদে নেই দিদি!...তাছাড়া খাবারটা ও বেলা থেকেই নষ্ট হচ্ছে। তারও সদগতি করতে হবে।

গয়লাবউ বলিল—দেখি কি সোণার খাবার নষ্ট হ্‌চ্ছে ?...কোথায় ?

কিশোরী ঘরের কোণ দেখাইল।

গয়লাবউ মাটীর হাঁড়ীটার ঢাকা খুলিয়াই অবাক্ হইয়া গেল!—হা ভগবান!—পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী তরুণীর ইহাই কি নৈশ ভোজনের আয়োজন!—এ যে পাকা তালের সামান্য একটুখানি অংশ!

গয়লাবউ হাসিবে কি কাঁদিয়া ভাসাইবে—ঠিক করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল—তাল খেয়েই কি আজ দিনমান চ'ললো দিদিঠাক্রুণ? রাতের বেলাতেও এই ব্যবস্থা? কিন্তু গাছটায় আর কতগুলো আছে? ফুরিয়ে গেলে কি তালগাছের পাতা সিদ্ধ করে পেট ভরাবে? আর আমি পোড়ারমুখী দুধ খেয়ে ঘি'য়ে আচমন করবো?...আজ জান্লাম,—পর যে, সে আপন কখনো হয় না। বুকের ভেতর আঁক্ড়ে রাখ্লেও না।

কিশোরী হাসিতে হাসিতে বলিল—তুই এতবড় বোকার ধাড়ী?... রাগের মাথায় এ সব কি বলছিস আজ?

অভিমানাহত হইয়া গয়লাবউ কহিল—রাগ আর কার ওপর করবো দিদিঠাক্রুণ! যার তার ওপর তো রাগ দেখানো মানায় না।...... কিন্তু দু'লক্ষবার ঘাট হ'য়েচে আমার। আজ থেকে সব কথার ইতি করছি।......অনেক দোষ ক'রেছি, পারো তো ভুলে যেয়ো!—বলিয়াই আর এক মিনিটও অপেক্ষা করিল না। ঘুটঘুটে আঁধারের ভয়াল বিভীষিকাও গ্রাহ্য করিল না।......

বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ থামে নাই। কিশোরী সিক্ত মেঝের উপর শুইয়া, লুটাইয়া লুটাইয়া রোদন করিতে লাগিল—মা! মা! দুনিয়ায় কার ভরসায় ওপর ভরসা রেখে আমায় ফেলে চ'লে গেলে? ......সঙ্গে নাও মা!—কোলে তুলে নাও। অনাদরে, অত্যাচারে, ভয়ে, বিপদে—নারী আমি, কেমন ক'রে বেঁচে থাক্বো? যার জন্তে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছ, আজ তাকে কি একটুও মনে পড়ে না মা? আর যে আমার সহ্য হয় না! একা এই অকূল পাথার বেয়ে কোন্ কিনারায় আশ্রয় পাবো—আজ তার পথ ব'লে দাও মা!

...দুঃখ, কষ্ট, শোক সব কিছুরই পুরোভাগে, বাঁচিয়া থাকার স্পৃহাই দৃঢ় হইয়া অন্তরে বাসা বাঁধিতে পারে।......ক্ষুধা তৃষ্ণায় কিশোরীর সমস্ত দেহটা অবসন্ন হইয়া পড়িল। অন্ধকারেই অনুমানের সাহায্যে গয়লাবউ মাটীর হাঁড়ি খুলিয়া পাকা তালের সন্ধান পাইয়াছিল, কিন্তু আনমনা অবস্থায় হাঁড়ির ঢাকাটা বন্ধ করে নাই।

সত্য সত্যই প্রদীপটায় তেল ছিল না। অন্ধকার ঘরের কোণে বসিয়া কিশোরী তালের হাঁড়িটা খুঁজিতেই, এমন একটা জিনিসের উপর তার হাত পড়িল, যাহার অঙ্গ বরফের ন্যায় শীতল, এবং অত্যন্ত মসৃণ!

কিশোরী প্রবল আতঙ্কে সরিয়া আসিতেই, তাহার ডান হাতে সাংঘাতিক জ্বালা অনুভূত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস্ ফোঁস্ গর্জ্জন!... আহা রে!—অভাগিনী!......ভাগ্যে তোর সর্প দংশনও লেখা ছিল!... বিধি লিপি!

সামান্যক্ষণ মূর্চ্ছাহতের মতই দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বাঁ হাতে ডান হাত খানা চাপিয়া ধরিয়া, কিশোরী ঊর্দ্ধশ্বাসে বাটীর বাহির হইয়া পথে নামিল।—তখনও ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি হইতেছে।

কাছাকাছি ছিল—গ্রামের পুরোহিত সিধু চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।

কিশোরী কাতর-কণ্ঠে বন্ধ দুয়ারে ঘা দিয়া ডাকিল—দাদামশায়! দাদামশায়!

—কে রে?—কেন?

—একবারটি দোর খুলুন দাদামশায়!—আমি কিশোরী। আমাকে সাপে কামড়েচে।...বড় জ্বালা করচে।

দাদামশায় ঘরের মধ্যেই সুখশায়িত অবস্থায় জবাব দিলেন—কি সাপ?

—তা তো দেখ্‌তে পাইনি। বড্ড জ্বালা!—সইতে পারি না। পায়ে পড়ি—একবারটী দোর খুলুন দাদামশায়!

—যা যা!—ভাবিস্‌নি, ও ব্যাটা ঢোঁড়া সাপে কেটেছে! বর্ষার দিন অলি গলি বেড়ায় ব্যাটারা!......চূণে হলুদে লাগিয়ে নিস্‌!...... বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়্‌গে যা—ভয় নেই।

—আর যে আমি একা থাক্‌তে সাহস পাচ্ছিনে ঘরে।......ভয়ঙ্কর জ্বল্‌চে। বুকখানা থর থর ক'রে কাঁপচে। পায়ে পড়ি দাদামশায়! দোরটা খুলে দিন। আমি গোয়াল ঘরের একপাশে প'ড়ে থাক্‌বো।

দাদামহাশয় আর কোন সাড়া শব্দ দিলেন না।

কিশোরীর সারা অঙ্গ তখন থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। হায় রে! গয়লাবউ পায়ে ধরিয়া সাধ্য সাধনা করিয়াছে—তবু সে আপনার গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার তরে, হেলায় সে সাধনার মূল্য রাখে নাই। আজ উন্নত মাথাটা পথের কাদায় মাখামাখি হইয়া গেল,—তবু তার অপরাধের যোগ্য শাস্তি পাওনা রহিল।

একটা জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ডোবার কাছে বসিয়া, কিশোরী মুখখানা ঊর্দ্ধ আকাশের পানে তুলিয়া, যাতনা-কাতর-কণ্ঠে ডাকিল—মা! মা!—তুমি যদি না দেখা দাও,—স্বর্গ থেকে ভগবানকে স্মরণ করিয়ে দাও—আমি আজ অপঘাতে, অসহায় হ'য়ে বিনা শুশ্রূষায় মরতে বসেচি। যদি পথ থাকে,—উপায় ক'রে দাও মা!......ওগো আর্ত্তের ভগবান!—ওগো বধির! একবারও কি পাপীর কথায় কাণ দেবে না আজ? কী

কুকাজ ক'রেছি ঠাকুর, যার জন্তে আজ এমন যাতনার ব্যবস্থা করলে?......

কথা বলিবার শক্তি এবং চলিবার শক্তিও ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল।—তবু হতভাগিনী প্রাণপণ শক্তিতে ডাকিল—ভগবান! ভগবান! ভয়ত্রাতা!—মধুসূদন!—আলো দাও—পথ দেখাও! রক্ষা করো!...

রাত্রি তখন নিশীথ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"কর্ণ দাও রুদ্ধ কোরে

কর প্রভু অন্ধ মোরে—"

অভিমানের বশে বাড়ী ফিরিয়া, গয়লাবউ ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ নিঝুম অবস্থায় বসিয়া রহিল। ভাবিল—অভাগিনী কিশোরীর উপর রাগ করা তার সাধ্যের অতীত। নহিলে প্রাণ কেন মানা মানে না! কেন ছুটিয়া ছুটিয়া তারই দুয়ারে যাইতে সাধ জাগে!

নন্দলাল বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছিল।

গয়লা বউ ডাকিল—ছোড়দা!

—কেন?

—সহর থেকে কাপড় আনতে বলেছিলাম যে একজোড়া? এনেছ?

—হ্যাঁ।

—বেশ রাঙা পাড় চওড়া শাড়ী তো?—যেমনটি ব'লেছি ঠিক তেমনি?

—হ্যাঁ।...কিন্তু ওসব ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে রামী। দিদিঠাকরুণ তোর দান তো নেবে না।...বড়লোক বাপের বেটী, ছোট লোক গয়লার দান নিলে যে তার মাথা কাটা যাবে!...বাপ্‌রে বাপ্!...মেয়ের কি দেমাক্! বলিয়াই সে আবার হুঁকায় টান সুরু করিল।
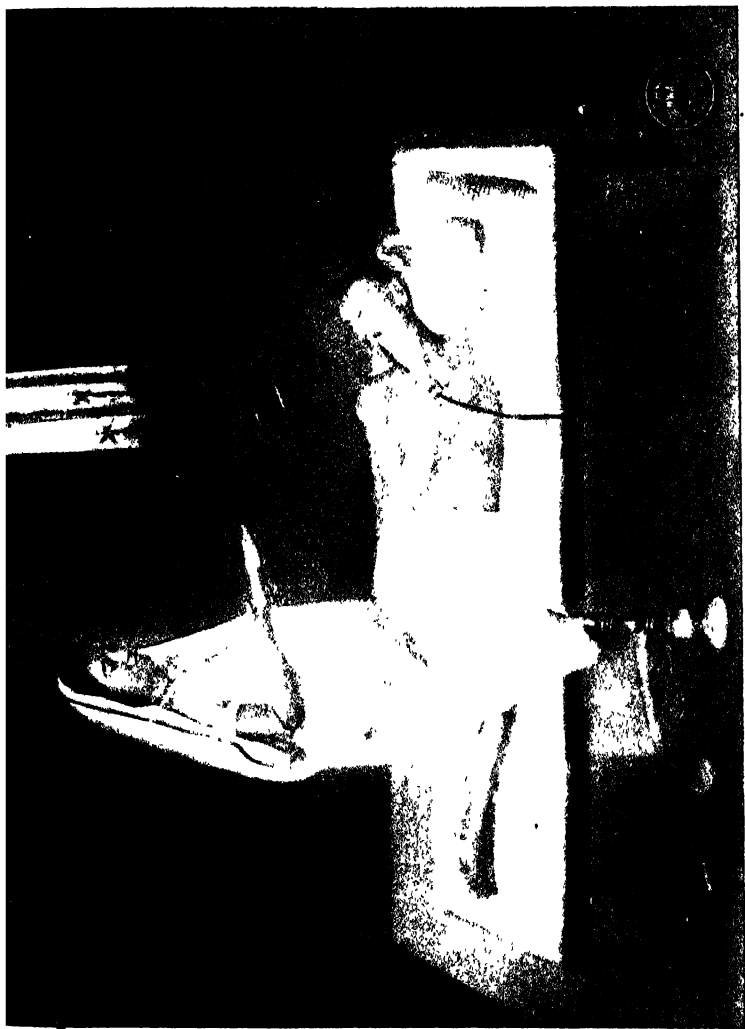
রামী—অর্থাৎ রামমণি গয়লাবউর নাম। কহিল—তুমি ভুল বুঝ্চো ছোড় দা! কিশোরী দিদি সে রকম মেয়ে নয়। সে বলে—যতক্ষণ ঘরে একরত্তি ক্ষুদগুঁড়ো থাক্‌বে, ততক্ষণ সে অন্যের কাছে হাত পাতবে না। ফুরিয়ে গেলে, আমি ছাড়া আপন ব'ল্‌তে আর কেউ তার নেই—একথাটা আজ দশবার মুখ ফুটে জানিয়ে দিয়েচে। বলিতে বলিতে গয়লাবউ ঘর ছাড়িয়া একবারে বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

...আকাশ তখনও পরিষ্কার হইয়া যায় নাই বটে, কিন্তু বৃষ্টি থামিয়া গেছে।

নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল—তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছিস রামী? আবার যেতে হবে না কি?...তারপর খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—যেতে হয় যা, মেয়েটা একা থাক্‌বে।—খুড়ীঠাক্‌রুণ মারা যাওয়ার পর, ও বাড়ীতে সে যে কি করে একা একা রাত কাটায়, ভাবলে আমিই ভয়ে সারা হ'য়ে যাই।...

গয়লা বউ কহিল—সে সাহস তার নিশ্চয়ই আছে। নইলে ব'ল্‌তো আমাকে।...কিন্তু তোমাকে একটুখানি কষ্ট করতে হবে দাদা!...যাবে একবারটি?

রাগিয়া নন্দলাল বলিল—নাঃ।...সে ছোট লোকের বাড়ী আর আমায় যেতে বলিসনি রামী। নন্দলাল জাত গয়লার ছেলে। এক রোখা তার স্বভাব। অপমানকে বড্ড ডরাই আমি।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে গয়লা বউ বলিল—কিন্তু একথা আমার বিশ্বাস হ'লনা ছোড় দা! দুনিয়া উল্টে যেতে পারে—এ আমার হয়তো বিশ্বাস হবে,

কিন্তু দিদি ঠাকৃরুণ তোমাকে অপমান ক'রেছে—মরে গেলেও বিশ্বাস করবো না।...ভুল কথা ব'লোনা ছোড় দা।

নন্দলাল হাতের হুঁকাটা দেয়াল ঠেস্ করিয়া রাখিতে রাখিতে কহিল—ভুল তুইই করলি রামী!...আজ মনের কথা বলি,—দিদি ঠাকৃরুণকে আমি দেব্তার চেয়েও বেশী ভক্তি করি ভাই।...আমি সেই বেইমান বামুনটার কথা ব'লছিলাম,—পশুপতি চাটুয্যে রে,—তোর কিশোরী দিদির বাপ!...ব্যাটা এমন পাজী!—

গয়লা বউ দাঁতে জিভ্ কাটিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। বলিল—ব'লতে নেই ছোড় দা!—হাজার হ'লেও বামুন,—কলিকালের দেবতা।

—কলির পিশাচ,—রাক্ষস সে। সে ছাড়া ষোলআনা বামুনকে আমি পা ধুইয়ে মাথায় রাখ্তে পারি। কিন্তু তাকে যদি পাই কোনোদিন, লাঠির ঘায়ে মাথার ঘি বের করে ছাড়বো। কিন্তু কি ব'লছিলি—কোথায় যেতে হবে?—কিশোরী দিদির বাড়ী? কেন?

গয়লাবউ কহিল—সারাদিনটাই এক রকম না খেয়ে র'য়েচে সে। একবাটী দুধ আর কিছু ক্ষীর রেখেচি,—দিয়ে এসো। খাবোনা খাবো-না করে নিতে চাইবে না। হয়তো ব'লবে—খাওয়া হ'য়ে গেছে; ...তবু দিয়ে এসো। তুমি ছাড়া তাকে আর কেউ খাওয়াতে পারবে না, নইলে আমিই নিয়ে যেতাম।

নন্দলাল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া কহিল—আমিই যে খাওয়াতে পারবো তার প্রমাণ পেলি কোথায়?

গয়লাবউ কহিল—তোমার একগুঁয়ে স্বভাবটুকু সে ভারি পছন্দ করে।—আমরা দোষ দিই, সে বলে—নন্-দা মানুষ নয়।

নন্দলাল আত্মপ্রশংসায় বিরক্ত হইয়া বলিল—হ'য়েছে হ'য়েছে, আর বিস্তে ফলাতে হবে না। বামুনদের সঙ্গে মিশে তোরও দেখ্‌চি খুব লম্বা লম্বা বুলি মুখস্থ হ'য়ে গেছে।...ওঃ নন্-দা মানুষ নয়!...নিজে অভাগী কিনা, তাই সকলকে বলে হতভাগা।...জাত গয়লা নন্দলাল—সে মানুষ নয়!...তবে কি অমানুষ না—ভূত?...দে কোথায় তোর দুধ-ক্ষীর আছে—মেয়েটাকে খাইয়ে আসি।

গয়লাবউ বাটিতে বাটীতে দুধ-ক্ষীর সাজাইয়া একখানা থালার উপর তুলিয়া, নন্দলালের হাতে দিল।......

...কিন্তু কোথায় কিশোরী? নন্দলাল দেখিল—ঘর খোলা, আঁধার হুম্‌কি দিয়া ভয় দেখাইতেছে,—ঘরে কেউ নাই!

—"দিদিঠাক্‌রুণ! কিশোরী দিদি!"—অনেকবার ডাকাডাকি করিয়াও যখন সাড়া মিলিল না, তখন খাবারের থালাখানা হাতে করিয়াই নন্দলাল দ্রুত বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিতেছিল,—ডোবাটার ধারে আসিয়াই সে একেবারে কিশোরীর সংজ্ঞাহীন দেহখানার উপর পা দিয়া ফেলিল।—চমকিয়া দুই পা পিছাইয়া, আবার ফিরিয়া দেখিল—মানুষ—কিন্তু কে, তাহা অন্ধকারে ঠাহর করিতে পারিল না। ঝুঁকিয়া অনেকক্ষণ দেখার পর, সে কতকটা বুঝিল—সম্ভবতঃ কিশোরীই।

খাবারের থালাটা সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া, সে বিনা দ্বিধায় কিশোরীর দেহটা তুলিয়া লইয়া অতি দ্রুত নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়া

আসিয়া, উঠান হইতে ডাক দিল—রামী! রামী! শীগ্‌গীর আলো নিয়ে আয়!—শীগ্‌গীর!

ব্যস্ততার সময় সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, রামীরও তাহাই হইল। আলো হাতে বাহিরে আসিবার সময় সে বার দুইতিন হোঁচট খাইল এবং হাতের আলোটাও বাতাস পাইয়া নিভিয়া গেল।

নন্দলাল অধৈর্য্য হইয়া বলিল—তোর কি একটুও জ্ঞান হ'ল না রামী?...ব'লচি শীগ্‌গীর আয়!

রামী নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া, পুনরায় আলো জ্বালিল, তারপর বাহিরে আসিয়া, কিশোরীর সংজ্ঞাশূন্য দেহটার প্রতি চাহিয়াই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

গায়ে মাথায় ও মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়া ব্যজন করিতে করিতে অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল তবু কিশোরীর সংজ্ঞা ফিরিল না। হঠাৎ সর্পদংশনের ক্ষত স্থান দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই নন্দলাল হায় হায় করিয়া উঠিল।......সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে রে রামী, আর রক্ষে নেই।......আসল কালের দংশন!...

—"অ্যাঁ, কি ব'লছো ছোড়্‌দা?......কালের দংশন কি?" বলিয়া রামী ঝুঁকিয়া, কিশোরীর ডান হাতখানা আলোর সাহায্যে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

নন্দলাল বলিল—কেমন ক'রে কাম্‌ড়ালো, কোথায় কাম্‌ড়ালো, কিচ্ছুটি জান্‌বার উপায় নেই। কিন্তু কি হবে এখন?......মন্ত্র তন্ত্র জানা ওঝা এখানে কে আছে—তা তো আমি জানিনে রামী! কাকে ডাকি বল্‌তো?

রামী চিন্তা করিতেছিল।

নন্দলাল অতিষ্ঠ হইয়া কহিল—ভাব্‌বার তো সময় নেই ভাই! রক্তের সঙ্গে বিষটা যদি মিশে যায়, তা হ'লে স্বয়ং মনসা ঠাক্‌রুণেরও সাধ্যি নাই যে, বাঁচিয়ে রাখ্‌বে।

রামী বলিল—উত্তোরপাড়ার রূপো হাড়ীকে ডাকো ছোড়দা!...... এ গাঁয়ের মধ্যে সে-ই এসব ভাল জানে।

নন্দলাল উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। অন্ধকারের হুম্‌কীকে সে একটুও ভয় করিল না।......মা মনসা! দিদিকে আমার বাঁচিয়ে দাও! বেচারী বড় অভাগী!

এদিকে রামী, কিশোরীর সংজ্ঞাহারা দেহ কোলে তুলিয়া চোখের জলে তাহার বুক ভাসাইয়া দিতেছিল।

নিশীথ রাত্রির অন্তের সীমায় দাঁড়াইয়া স্তব্ধ প্রকৃতি তখন ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছিল। বিশ্ব চরাচরে কেহ জাগ্রত নাই! শুধু সুদূর আকাশের বুকে নক্ষত্রের সুস্পষ্টতা লক্ষিত হইতেছিল।

প্রবাদ আছে, যাহারা সর্পদংশনের মন্ত্র তন্ত্র জানে, সংবাদ পাইবা-মাত্রই সহস্র প্রয়োজনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে ছুটিয়া আসিতে হয়, নতুবা ভবিষ্যতে মন্ত্র দ্বারা উপকার পাওয়া যায় না।

রূপনাথ হাজ্‌রা সংবাদ শ্রবণ মাত্রই ছুটিয়া আসিল এবং রোগী দেখিয়াই একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস মোচনান্তে বলিল—কপাল! সাপের লেখা, আর বাঘের দেখা,—কপালেই সব হয়।......কিন্তু অবস্থা ঠিক ভাল ঠেক্‌চেনা নন্দ! তারপর একটানা সুরে সমস্ত প্রাণ দিয়া সে মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করিল।

পুরাপুরি একটি ঘণ্টা এইরূপ মন্ত্র আবৃত্তি চলিল কিন্তু কিশোরীর সংজ্ঞা পাওয়া ত দূরের কথা, নড়াচড়ার ভাবও টের পাওয়া গেল না।

হতাশ ভাবে খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া রূপনাথ বলিল—নন্দ ভাই, রাত তো ভোর হ'য়ে এলো, কিন্তু ফল পেলাম না।......একবারটি সহরে না গেলে বোধহয় বাঁচাতে পার্‌বো না।...খুব শীগ্‌গীর যেতে হবে কিন্তু, পার্‌বে?

নন্দলাল বলিল—পারবো কি পার্‌বোনা সে কথা বাদ দাও রূপোদা! —কি কর্‌তে হবে তাই বলো, সহর তো সামান্যি কথা, দরকার হ'লে আমি সংসারটা ঘুরে আস্‌বো।

রূপনাথ কহিল—ঠাক্‌রুণের বাপকে খবর দিতে হবে। এ ছাড়া অন্য পথ নাই।

মুখ ফিরাইয়া নন্দলাল বলিল—কিচ্ছু দরকার নেই রূপোদা! ম'রে গেলে, সৎকার করবো আমরাই। গাঁয়ে ঢের বামুন আছে। তোমার আমার সঙ্গে দিদিঠাক্‌রুণের যে সম্বন্ধ, ওঁর বাপের সঙ্গে তা-ও নেই। কেন হায়রাণ করবে আমাকে?

জিভ্‌ কাটিয়া রূপনাথ বলিল—পাগল আর কি! তুমি তো জানোনা নন্দভাই! চাটুয্যেমশায় যে আমার গুরু। এসব বিদ্যে তাঁর কাছেই তো শিক্ষে করেছিলাম। সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্র চাটুয্যের চেয়ে এ তল্লাটে কেউ ভাল জানে না। পাকা ওস্তাদ্‌!

বিস্মিত নন্দলাল ও গয়লাবউ—রামী, একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—কে? কিশোরী দিদির বাপ?......

—হ্যাঁ হ্যাঁ তিনিই।

নন্দলাল হাতের লাঠিখানা আস্তে আস্তে বার তিন চার মাটীতে ঠুকিয়া কি ভাবিল, তারপর একটা কথাও না বলিয়া শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া দিল—পশুপতি চাটুয্যেকে গাজলপুরে আনিবার জন্য।

......পূর্ব্বাকাশে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। তাহারই পানে চাহিয়া চাহিয়া রামী ভাবিতে লাগিল—মাতৃগর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়া এই হতভাগিনী তরুণী, বিশ্বের দুয়ারে শুধু নির্য্যাতনই লাভ করিয়া আসিয়াছে—কখনো মানুষের হাতে, কখনো বিধাতার বিধানে! সুখের মুখ সে কখনও দেখিতে পায় নাই। আজ হয়তো মরণ তাহার দুন্দুভি নিনাদে এই অভিশপ্ত আত্মার চির সদ্গতির জন্য আশে পাশে অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু ইহজীবনের অপূর্ণ সাধ-আকাঙ্ক্ষা তার অপূর্ণই রহিয়া গেল।

প্রাতঃকাল হইল। সিধু চক্রবর্ত্তী সর্ব্বপ্রথমে কিশোরীর বাড়ীখানায় চোখ বুলাইয়া লইয়া, গ্রামের বুড়ো বটগাছের তলায় আসর জাঁকাইল—ওহে সব শুনেচ?—কিশোরী ছুঁড়ী পালিয়েছে!

সভায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল!—তাই তো বলি! ঐ ভাঙা ভুতো বাড়ী খানায় একা একা ছুঁড়িটা কোন্ সাহসে রাত্ কাটাতো!

সিধু কহিল—কাল রাত্তিরে যখন পালায়, আমি টের পেয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছিস্?......জবাব দিলে—ঢোঁড়া সাপে কামড়ে দিয়েছে, তাই রূপো হাড়ীর কাছে ওষুধ আনতে যাচ্ছি।...

সকলে কহিল—উঃ—পেটে পেটে শয়তানি মতলব!

একজন বলিল—ঘরখানা বুঝি খোলা প'ড়ে রয়েচে?

সিধু কহিল—খোলাই ছিল, আমি শিকলটা টেনে দিয়ে এসেচি।... যা-ই থাক্, একটা মাটির ভাঁড় থাক্‌লেও সে পশু চাটুয্যের কাজে লাগবে। দোষ ঘাট যা করুক—তবু পশুপতি তো এই গাঁয়েরই মানুষ হে!......যাক্ ছুঁড়ী নিজের পথ নিজেই বাছাই করে নিলে। বাপে যখন সত্যি সত্যিই দেখ্‌লে না, তখন কি আর করে?

একজন ভাবিতে ভাবিতে বলিল—কিন্তু ঢোঁড়া সাপটা কি আকেলে কাম্‌ড়ালে?......পশু চাটুয্যের মেয়ে,—তার গায়ে সাপের কামড়!...... বাপ যার মন্তরের জোরে হাজার সাপকে নাচাতে জানে!

ইহাকেই বলে—আশ্চর্য্য ব্যাপার! কথার শেষ রেশটুকু শেষ হইতে না হইতেই স্বয়ং পশুপতি চাটুয্যে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভাশুদ্ধ লোক পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিল।

সিধু সম্বর্দ্ধনা করিল—কি হে পশু বাবু যে!......এতকাল পরে পথ ভুলে নাকি?......এটা যে গাজল পুর! এখানে এমন ভাবে হঠাৎ আসা—এ যে স্বপ্নেরও অগোচর!

পশুপতি কহিলেন—কি আর করি?...মেয়েটার জন্যেই আস্‌তে হ'ল। ...নন্দ গয়লার মুখে খবরটা শুনেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌চি। এখন ভালয় ভালয় ফিরিয়ে আন্‌তে পারি, তবেই মঙ্গল।...শুন্‌লাম সঙ্কটের অবস্থা!

—আর অবস্থা!......দেহ পচ্‌তে সুরু হ'লে, সে অংশ বাদ দেওয়াই মঙ্গল। ফিরিয়ে এনে কাজ কি পশু?...যে গেছে, তাকে যেতে দেওয়াই যুক্তির কথা।

পশুপতি কথার জবাব না দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, সিধু বাধা দিয়া কহিল—তাকে আর এ তল্লাটে পাওয়া যাবে না পশু! বিশেষতঃ গাজলপুরের বুকে ব'সে...আমরা থাক্‌তে...

ইহারই মধ্যে নন্দলাল আসিয়া বলিল—এখানে ব'সে আড্ডা জমিয়েছ ঠাকুর?......মেয়েকে নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি হচ্ছে, আর বাপ তুমি, কতকগুলো গুলীখোরের সঙ্গে—

—চোপ্...ব্যাটা গয়লা কাঁহাকার!

নন্দলাল ভ্রূকুটী করিয়া বলিল—অন্য সময় হ'লে হাস্‌তাম। কিন্তু এখন তার সময় নয়।......নন্দ গয়লাকে আজো বুঝ্‌তে যদি বাকী থাকে ঠাকুর, তা হ'লে ঘণ্টা খানেক সবুর করো,—কিশোরীদিদির জ্ঞানটুকু ফিরে এলেই, আমি নিজে এসে তোমাদের সঙ্গে ভালরকম পরিচয় করবো।

সিধু কহিল—কিশোরী কোথায়? তোদের বাড়ীতে?...কোত্থেকে ধ'রে নিয়ে এলি?......বামুনদের কাছে বিধি ব্যবস্থা না জেনে, ঘরে জায়গাই বা দিলি কেন রে—নাবালক গয়লা?

হাতের লাঠিটা অনেকখানি উঁচু করিয়া তুলিয়া, নন্দলাল বলিল—মুখে মুখে সব লাগাম দাও ঠাকুর!—আমার নাম নন্দলাল, জাত গয়লার ছেলে। লাঠি খেলার শিষ্য আমার এই বয়েসে অনেক আছে। তারপর পশুপতিকে কহিল—আস্‌বে কি আস্‌বে না গো? ওই ছোটলোক ভদ্র লোকগুলো দিনকে রাত বানিয়ে দিতে পারে। ওদের কথা যদি শুন্‌তে সাধ হয়, ফিরে এসে শুনো।

পশুপতি যাইতে উদ্যত হইবা মাত্র, সিধু বলিয়া উঠিল—মোছলমানের সঙ্গে বেরিয়ে গেছলো কাল।—আমি স্বয়ং সাক্ষী!

লাঠিগাছটা ঠিক সিধু চক্রবর্ত্তীর মাথার উপর তুলিয়াই, নন্দলাল ক্রোধবেগ সম্বরণ করিয়া লইল। কহিল—ঠাকুর! সত্যি বল্‌ছি, তোমাকে খুন করলে, জীবনের সমস্ত পাপ আমার ধুয়ে যাবে। তুমি দুনিয়ার পাকা শয়তান।......ফের যদি আমার দিদিকে লক্ষ্য ক'রে, তার বাপের কাছে অকথা কুকথা কইতে এসো, তা হ'লে ছেলে পিলে নিয়ে ঘর-সংসার করার সাধ, এই লাঠির ঘায়েই মিটিয়ে দেব।......চলো খুড়োঠাকুর!—আগে দিদিকে আমার বাঁচিয়ে দেবে চলো।

পশুপতি কাহারও কথায় আর কর্ণপাত করিলেন না। বরাবর নিজের বাড়ীর দিকেই যাইতেছিলেন, কিন্তু নন্দলাল বলিল—ও বাড়ীতে নেই।...সে রয়েচে তার বোনের বাড়ীতে।

......পশুপতিকে লইয়া নন্দলাল যখন বাটী পৌঁছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই কিশোরীর সংজ্ঞা ফিরিয়াছে।

কিশোরী পিতার পদধূলি লইল। তখনো সে উঠিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য পায় নাই।

পশুপতি কহিলেন—রূপনাথই ভাল করেছে।......ভয় নেই আর। আমি তা হ'লে চ'ল্‌লাম। কাছারীর বেলা হ'য়ে যাচ্ছে।

কিশোরী দুহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।...এই তার পিতা!... একটা ভর্ৎসনার সম্ভাষণও যাঁহার কণ্ঠে জন্মা নাই।

নন্দলাল বলিল—সত্যি কথা বল ঠাকুর!—তুমি মানুষ না রাক্ষস?

কিশোরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আজ বাদে কাল মায়ের আমার শ্রাদ্ধ করতে হবে বাবা!—তুমি তার উপায় করে দিয়ে যাও। আমার যে একটা কানাকড়িও সম্বল নেই আর!

পশুপতি কহিলেন—শাস্ত্রে আছে, বালুর পিণ্ডি দিলেও কাজ হবে। তাতে পয়সাকড়ির খরচ নেই।

নন্দলাল তীব্র ভাষায় বলিল—দূর হও ঠাকুর! বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"জীবন যথন করেছি পণ,

অপমানে আর কি ডরি।"......

থানার দারোগা বাবু আপোষে মিট্‌মাট্ করিয়া দিয়াছিলেন—হয় পশুপতি চাটুয্যে কিশোরীকে তাঁহার সহরের বাসায় লইয়া গিয়া যথা-রীতি পিতৃকর্ত্তব্য পালন করিবেন, নতুবা গাজলপুরের বাড়ীতেই তাহার বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতাবৎ পশুপতি দুইটির একটি সর্ত্তও মানিয়া চলেন নাই।......

আজ কিশোরীর মাতৃশ্রাদ্ধ।

সিধু চক্রবর্ত্তী পৌরাহিত্য করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। স্নানান্তে রামমণির দেওয়া নববস্ত্র পরিধান করিয়া, কিশোরী ভগ্নকুটীরের দাওয়ায় বসিয়া রোদন করিতেছিল।

গয়লাবউ রাণী আসিয়া কহিল—গালে হাত দিয়ে ভাবচো কি দিদি-ঠাক্‌রুণ? এর পর বেলা হ'লে সাম্‌লাবে কেমন করে? চকোত্তিঠাকুর এসেছিলেন?

চোখ মুছিয়া, ধরাগলায় কিশোরী বলিল—তিনি আসবেন না গয়লাবউ!

—কেন?

—আমার অপরাধ হ'য়েচে।

—কি অপরাধ ?

—তা বলেন নি। নন্‌-দা নাকি সব জানে। কিন্তু তুইও কি জান্‌তে পারিস্‌নি গয়লাবউ ?...অপরাধ জান্‌তে পারা যায় না, অথচ সামাজিক বিচারে আমার উচিত দণ্ড পাওনা হ'য়ে গেল ?

রামী নীরবে বসিয়া রহিল।...ব্রাহ্মণের সামাজিক বিধান, গয়লানীর তাহাতে কথা বলিবার কি-ই বা ছিল !

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—নন্‌-দা কোথায় রে ?

—সহরে গেছে যোগান দিতে।...কেন ?

—যদি আর কোথাও পুরুৎ পাওয়া যেত, বাবার হুকুম মত শাস্ত্রের কথাটাই পালন করতাম। অভাগী মাকে একটা বালুর পিণ্ডিও দিতে হবে ভাই!......আমার বাবার আদেশ, নিশ্চয়ই মা স্বর্গ থেকে তৃপ্তি পাবেন।

ইহারই মধ্যে নন্দলাল আসিয়া পৌছিল।

রামী কহিল—ব্যাপার শুনেছ ছোড়্‌ দা ?—গাঁয়ের কেউ আসবে না। সিধু চক্কোত্তি পুরুতের কাজ করতে রাজী হয়নি।

গম্ভীর হইয়া নন্দলাল বলিল—সে আমি জানতাম। কিন্তু দিদিঠাকৃরুণ!—তোমার আর কোনও হুকুম আছে ? পুরুৎ চাই ? চলো ঐ ব্যাটা সিধে ঠাকুরকেই গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনি।

তাড়াতাড়ি কিশোরী বলিয়া উঠিল—কদাচ ও কথা মুখে এনো না দাদা! আমি গরীব, মায়ের শ্রাদ্ধটা যেন পণ্ড না হয়। যদি হাতে পায়ে ধরলে আস্‌তেন, আমি তাই করতাম।

নন্দলাল উত্তেজিত হইয়া বলিল—সে সব দিন অনেককাল চ'লে গেছে দিদি!...এখন তোমার হুকুম কি তাই বলো।

কিশোরী বলিল—হুকুম নয় দাদা!—সাধ,—যদি বাবাকে একবারটি আনতে পারো!...মাথা গরম করবার সময় এ নয়, যেমন করে পারো তাঁকে নিয়ে এসো দাদা! বাবা না এলে, আমার আপন ইচ্ছায় কোন কিছুই করা উচিত হবে না।

নন্দলাল অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। কহিল—তোমার কপালে বিস্তর দুঃখু আছে কিশোরী দিদি! খুড়ীঠাকরুণ ম'রেও খালাস পেলেন না। অত বড় মেয়ে তুমি, একটা পিণ্ডি পর্য্যন্ত তাঁকে দিতে পারলে না?...কিছু না থাক্‌, হাত-পা-মুখ চোখ তো খোয়া যায় নি!...হুকুম তামিল করতে নন্দ গয়লাও যে-আজ্ঞের চাকর হ'য়ে হাজির রয়েচে!... মাঝখান থেকে যেচে অপমান নিয়ে—কি হবে তোমার? খুড়োঠাকুরকে আর সাধাসাধি করতে যেয়োনা, কাজ হাঁসিল হওয়া দূরের কথা, এলেই সব পণ্ড হয়ে যাবে—এ আমার সব চেয়ে সত্যি কথা।

কিশোরী বলিল—কাজ আমার একার নয় নন্‌-দা, তাঁরও। পণ্ডই যদি হয়, তো আমারই কি একলার পণ্ড হবে?...আমার সব চেয়ে বড় অনুরোধ,—তাঁকে যেমন করে পারো একঘণ্টার তরেও গাজলপুরে নিয়ে এসো।

হাতের লাঠিখানা নামাইয়া রাখিয়া, নন্দলাল কহিল—রামী! দিদি-ঠাকরুণের ঘর থেকে একটুখানি তেল দে তো, মাথাটা ডুবিয়ে আসি।

রামী কহিল—সহর থেকে ফিরে এসে মাথা ডুবিয়ো।...যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো গে।

নন্দলাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না না, মাথাটা এমনিতেই গরম হ'য়ে রয়েচে। যেখানে যাচ্চি,—ঠাণ্ডা না হ'য়ে গেলে—উল্টো ফল ফল্‌বে।... কিন্তু ভয় নেই দিদি ঠাক্‌রুণ! নন্দগয়লা বোকা হলেও, কাজ পণ্ড করা তার স্বভাব নয়। যেমন করে পারি খুড়োঠাকুরকে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আস্‌বো। কিন্তু খোসামুদীর পালা গাইতে গিয়ে রক্তারক্তির পালা গেয়ে না ফেলি—এইটুকুই আমার বেশী ভাবনা হচ্ছে।

কিশোরী সশঙ্কিত হইয়া বলিল—আমিও ঠিক ঐ কথাটাই ভাবছিলাম দাদা! সর্ব্বদার জন্যে মনে রেখো—তোমাদের কিশোরীর তোমরা ছাড়া কেউ নেই, আর ত্রিসংসারে তার মতন অভাগাও কেউ জন্মায়নি। নইলে চিরজীবন জ্বলেপুড়ে খাক্‌ হ'য়ে, মরণে শান্তি পেলে যে মা,—সেই মায়ের উদ্দেশে একটা শ্রদ্ধার পিণ্ডি দিতেও পদে পদে বাধা পাচ্ছি আজ!

নন্দলাল ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল।......

দুইচারি পা চলিতে না চলিতেই তাহার সর্ব্বপ্রথমে সাক্ষাৎ মিলিল—সিধু চক্রবর্ত্তীর। কহিল—কি ঠাকুর!...ভা-রি আরাম পাচ্ছ—না? পাপের ঝুলিটা, মিছিমিছি ভারি করে লাভ কি হচ্ছে ঠাকুর? পরকালের ভাবনা জাত গয়লারে ঢের থাকে, কিন্তু বামুন পণ্ডিতদের কি মোটেই থাক্‌তে নেই?...স্বর্গবাস বুঝি তোমাদেরই একদম্‌ একচেটে?...পাপই কর আর চুরিডাকাতি খুন-জখমই কর, তোমাদের বুঝি সাতখুন মাপ?

সিধুঠাকুর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া কহিল—সকালবেলায় বাজে কথার দরকার নেই।......যেখানে যাচ্ছিস যা।

নন্দলাল লাঠিখানা বাঁ-হাত হইতে ডান হাতে ধরিয়া বলিল—হ্যাঁ যাচ্ছি,...দাঁড়াবার আমার মোটেই সময় নাই। যাচ্ছি পশুচাটুয্যের কাছে। কিন্তু তোমার সঙ্গেই আমার বেশী দরকার ঠাকুর!......ফিরে এসে যেন দেখ্‌তে পাই—খুড়ীঠাকুরুণের ছেরাদ্দ-শান্তির মাঝামাঝি শেষ হ'য়ে গেছে।...কিশোরী দিদি তোমার জন্তেই ব'সে রয়েচে, শীগ্‌গীর যাও—হাতাহাতি উয্যুগ পত্তর সেরে ফেলো গে। যতই হোক্, দিদি-ঠাকুরুণের কতই বা বয়েস।

ফুলের সাজিটা ডানহাত হইতে বাঁ হাতে লইয়া, ডান হাতখানা নাড়িতে নাড়িতে সিধু কহিল—মুখখানায় মহা ব্যাধি হবে। পচে খস্ খস্ ক'রে চামড়াগুলো খুলে যাবে।...ব্যাটা ছোট লোক, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

নন্দলাল অকস্মাৎ বিনীতভাব ধারণ করিল। কহিল—পা'র ধূলো চাটতেই তো এই ছোট জাতের জন্ম হ'য়েচে চক্কোত্তি মশায়! খালি তোমরাই মাঝে মাঝে মাথা খারাপ ক'রে দাও, নইলে জাত গয়লা নন্দ-লালের সাধ্যি কি যে সিধুঠাকুরের সুমুখে লাঠি হাতে দাঁড়ায়! কিন্তু আর তো আমার দাঁড়াবার অবকাশ নেই, সহর থেকে এক্ষুণি ঘুরে আস্‌তে হবে।...তা হ'লে দয়া করে যেয়ো ঠাকুরমশায়! কিশোরীদিদি তোমাদেরই তো আপনার লোক...

সিধু চক্রবর্ত্তী আপন মনেই বকিতে বকিতে চলিয়া যাইতেছিল—গাঁয়ের বুকে ব'সে যা ইচ্ছে তা-ই করবে,—আমি পা ধুতেও যাবো না সেখানে। এ কি যেমন তেমন দোষ না কি?

নন্দলাল আরক্ত মুখে ফিরিয়া বলিল—ভগবান তার বিচার করবেন।

তুমি আমি কে ?......একটা শেষ কথা তোমায় ব'লে যাচ্ছি ঠাকুর ! যদি না যাও, ফিরে এসে কিশোরী দিদির বাড়ীতে যদি তোমায় না দেখি, তা হ'লে ঐ বেলের মত মাথাটা ভাঙ্তে গিয়ে আমার এতকালের পাকা লাঠিখানাও যদি দু টুক্রো হয়—তবু দুঃখু ক'রবো না। বস্—এই আমার পষ্টাপষ্টি কথা রইলো।...বলিয়াই আর সে অপেক্ষা করিল না।

পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সিধুচক্রবর্ত্তী ভাবিল—এই মূর্খ অপদার্থ নীচ জাতিটার উচ্ছেদসাধন করিতে হইলে কিরূপ অস্ত্রের প্রয়োজন!...অন্যান্য সহযোগীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ভাবিতে ভাবিতেই সে বাটীর দিকে চলিয়া গেল।

* * * গ্রামের ব্রাহ্মণদলের এই অযথা কটূক্তির জন্য কিশোরী এতটুকু মুশ্ড়িয়া পড়ে নাই। সে যেন আপন চরিত্র-মহিমায় আপনি উন্নত। বাহিরের প্রচণ্ড কোলাহলকে সে গ্রাহ্যের সীমায় আনিতে চাহে না। শতছিন্ন বসনে লজ্জা নিবারণ করিয়া, আপন জীর্ণ কুটিরের মাঝে অনশনে থাকিয়া, তিলে তিলে, বিন্দু বিন্দু শোণিতক্ষয়ে সাধ-কামনাময় জীবনের ভীষণ অবসান করিয়া দিবে সে, তবু স্বার্থলোলুপ অবিশ্বাসীজনের কপট স্নেহ-ছায়ায় আশ্রয় মাগিবে না!...

রামমণি আজ ভোরবেলা হইতেই কিশোরীর সঙ্গ ছাড়ে নাই। গ্রামের লোকের এই অতি বড় অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিরূপ প্রতিবাদ করা যায়—তাহারই পরামর্শ চাহিবার জন্য, যখন সে কিশোরীর নিকট প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, তখন স্মিতমুখে শান্তভাব আনিয়া কিশোরী বলিল—তাদের কাজ' তারা করুক্, আমার পথ থেকে আমি কিছুতেই স'রে যাবো না ভাই। আমি শুধ একটা কথা জানি,—মনের বলই সবচেয়ে বড়। আমি

ম'রবো, জগৎ থেকে লুপ্ত হ'য়ে যাবো, তবু পরের দোরে হাত বাড়াবো না, পরের ভয়ে ভীত হবো না।

রামী ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—কিন্তু আমাকে আর পর ভেবোনা দিদি-ঠাক্রুণ! আমার তো আপন ব'লতে ভূ-ভারতে কেউ বেঁচে নেই। বলিতে বলিতে রামীর দুটী চক্ষু অশ্রুর কুহেলীতে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল।

ম্লান হাসি হাসিয়া কিশোরী বলিল—তুই এমন বোকা!...হাঁরে কতদিনই তো ব'লেচি,—আপন ব'ল্‌তে শুধু তোরাই রয়েছিস।...আজ কেন, বরাবরই ভেবে রেখেচি, সাহায্য যদি নিই তো তোদের কাছথেকেই আমি আপন মুখে চেয়ে নেব। এই তো কত জিনিসই তোরা দিচ্ছিস। ...সে দিন সাপের কামড়ে মরতে ব'সেছিলাম—কে আমায় বাঁচিয়েছিল? ওরে রামী! ভগবান যদি দীনের বন্ধু হন, তা হ'লে তোদের মধ্যেই তিনি দীনবন্ধু হ'য়ে আমার সাম্‌নে র'য়েচেন।

উভয়ের কথাবার্ত্তার মাঝখানে, চার পাঁচজন গয়লা ভারে ভারে দুধ ও ক্ষীর ছানা মাখন ইত্যাদি লইয়া হাজির হইতেই, বিস্মিত কিশোরী বলিয়া উঠিল—এসব কি গয়লাবউ?...জানিস আজ কত কচি ছেলে না খেয়ে কেঁদে কেঁদে সারা হবে? কত আফিংখোর হাই তুলে তুলে 'মরণ হোক্ তো বাঁচি' ব'লে তোকে অভিসম্পাত দেবে? এ তোর অন্যায় হ'য়েচে রামী! নিয়ে যেতে বল্‌। শ্রাদ্ধ করবার পুরুৎ নেই, দুধ ছানায় কি দরকার?

গয়লাবউ কখন যে গয়লাদের বাইতে ইঙ্গিত করিয়াছে—কিশোরী তাহা মোটেই টের পায় নাই। সে দেখিল—পাড়ার দু পাঁচটি ছেলেমেয়ে

এবং দুধ ছানার হাঁড়িগুলিই প্রাঙ্গনে বর্ত্তমান। দাওয়ায় বসিয়া শুধু সে নিজে এবং তার দুঃখ-সঙ্গিনী রামী।

গয়লাবউ কহিল—চলো দিদিঠাকরুণ, দু'জনে হাতাহাতি হাঁড়িগুলো ঘরে তুলি।...বামুনের ভোগ হবে, যদি কিছুতে মুখে ঠেকিয়ে ফেলে!...

ক্ষীণ হাসিয়া কিশোরী বলিল—বামুনের ভোগ তো হবেনা রামী, যদি হয় তো, যারা বামুন নয় তাদেরই হবে। এখানকার বামুনদের মান বজায় রাখ্‌তে আমরা যে জানিনে ভাই!

কিন্তু ভোগ কাহারও হইল না। নিয়তিই সকল সমস্যার সমাধান করিলেন:—

পাড়ার চার পাঁচটি ডাঙ্‌পিটে ছোকরা খানকতক লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিয়া মাটীর পাত্রগুলি ভাঙিয়া দিল। তাহাদের দ্রুত পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাঙ্গণটা তখন দুগ্ধের স্রোতে সাদা হইয়া গেছে!

কিশোরীর মুখখানায় ঈষৎ ভাবান্তর হইল মাত্র, কিন্তু রামমণি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল—তোর থাক্‌বার ঘর নেই, জল খাবার ভাঁড় নেই, লজ্জা ঢাক্‌বার একখানা ছেঁড়া বাকল অবধি নেই, তাই তোকে পথের কুকুরে কামড়াতে আসে। কিন্তু আমি এ সইবো না কিশোরী, আমার কিসের অভাব? আর কিছু না থাক্—যতদিন ছোড়্‌দা আছে, ততদিন আমার সব আছে; আমি দেখ্‌বো—এ কাজ কে করলে।

কিশোরী হাত ধরিয়া রামীকে নিকটে বসাইল। শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে কহিল—ওরে রামী!—ছোড়্‌দা কি খালি তোরই একার?—আমারও সে দাদা হয়। কিন্তু কপালের লেখা!—এর আর খণ্ডন নেই

ভাই! যার অমন বাপ, বেঁচে থাকতে চোখের দেখা দেখ্‌লে না,—তার চেয়ে পোড়া বরাত কার হ'তে পারে?| আমার চোখের জলে দরিয়া তৈরী হচ্ছে,—ওরা সেই দরিয়ার বুকে মনের সুখে সাঁতার দিচ্ছে,—ভগবান বুঝি এইটুকুই চেয়েছেন।...বলিতে বলিতে সহসা কিশোরী দুটী হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—উঃ মাগো—আর কত সয়? কত সইতে বলো আর?

রামী তখন উচ্চ চীৎকার সুরু করিয়াছে,—গাজলপুর ধূ ধূ করে জ্বলবে!—আমার ভিটে-মাটী উচ্ছন্ন যাক্—তবু আমি দেখ্‌বো—কত লোকের কত ধনদৌলত আছে!

কিশোরী কথা কহিল না। বোধ হয় তাহার আর্ত্ত ব্যথাহত অন্তর, বিশ্বনিয়ন্তার দরবারে অনুযোগ করিতেছিল—হে জগদীশ্বর! সমুদ্রের মাঝে বিছানা পেতে রেখেছি,—শিশির-কণায় আমার কতটুকু ভয়? সুবিচার যদি না কর,—বিচারপ্রার্থী হ'য়ে বিচারকের বিরুদ্ধে কি করবো আজ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"তোমায় নেয় না কেন যম"......

সমস্ত রাত্রির মধ্যে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটাহাঁটি করিয়া, ভোরের দিকে পশুপতি চাটুয্যের গাঢ় নিদ্রা আসিয়াছিল।

আজ তিন দিন যাবৎ সৌরভী বাসায় নাই। সহর হইতে চার পাঁচ মাইল তফাতে, তাহার মায়ের বাড়ী চলিয়া গেছে,—চাটুয্যে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সমস্ত রাত্রিটাই হাঁটাহাঁটি করিয়াছেন। একবার যাওয়া, পুনরায় ফিরিয়া আসা, সেখানে বসিয়া বসিয়া কর্ম্মকার-দুহিতার পদসেবা করা—বড় যেমন তেমন ব্যাপার নয়।...ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়াই এই প্রগাঢ় নিদ্রা।...বাড়ীখানা রৌদ্রে ভাসিতেছিল।

নন্দলাল সদর দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকিল—খুড়োঠাকুর! শীগ্গীর দোর খুলে দাও।

কিন্তু খুড়োঠাকুরের ঘুম ভাঙিল না।......বার কতক ধাক্কা দিয়া ডাকাডাকি করার পর, নন্দলাল অতিষ্ঠ হইয়া দরজার অর্গলটা ভাঙিয়া ফেলিল।.. কিশোরী আজ সত্যসত্যই বিপন্ন, এ হেন বিপদে সহানুভূতি দেখাইবার শক্তি শুধু পশুপতিরই আছে, সুতরাং নন্দলাল বিলম্ব সহিতে না পারিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছে।

বদ্ধ কক্ষদ্বারে আঘাতের পর আঘাত করিবার ফলে, পশুপতি জাগ্রত হইলেন এবং ঘরে থাকিয়াই ব্যস্ততার সহিত কহিলেন—কে

সৌরভী ?...এই যে খুলচি দাঁড়াও!......তারপর দরজা খুলিতেই সম্মুখে কালান্তক যমের মত নন্দলালের বিশাল আকৃতিটার পানে চাহিয়াই দুই পা পিছাইয়া আসিলেন। তারপর সংযতকণ্ঠে কহিলেন—ও—নন্দলাল!.........কেন বল তো?—এত সকালে কি মনে করে? নন্দলালের এত বেশী ক্রোধ হইতেছিল—ইচ্ছা করে—হাতের লাঠিখানা পশুপতির মাথায় বসাইয়া দেয়!......স্ত্রীর শ্রাদ্ধের কথা কি এই স্বধর্ম্ম ত্যাগী কাপুরুষের এতটুকু স্মরণ নাই! কহিল—এক্ষুণি আমার সঙ্গে গাজলপুর যেতে হবে। তৈরী হও!

দারোগাবাবু শাসাইয়া দেওয়ার পর হইতে, পশুপতি নন্দলালকে মনে মনে যথেষ্ট ভয় করিতেন, এবং বাহিরেও অনেকখানি সংযত ও ভদ্রভাবে কথা কহিতেন। বলিলেন—হঠাৎ গাজলপুরে!—কেন? কিশোরী ভাল আছে তো?

নন্দলাল আরো রাগিয়া গেল। কিন্তু সংযত হইয়া বলিল—কিশোরীর আর থাকা থাকির দাম কি আছে খুড়োঠাকুর! মাথার ওপর যার লাখোলাথ সাপে ছোবল দিতে সুরু করেছে, তার বেঁচে থাক্‌বার ভরসা কোথা? পরাণটুকু গলার কাছে ধুক্ ধুক্ করছে,—তুমি বাপ—মেয়ের দুঃখু ঘুচিয়ে দাও গে। টুঁটিটা জোরে টিপে ধরলেই হতভাগীর সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।......এখন মুখ ধুয়ে, চলো—আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

মুখখানা আঁধার করিয়া পশুপতি বলিলেন—আমারও যে মহাঝিপদ নন্দলাল!......দেখ্‌ছো না—বাড়ীঘর খাঁ খাঁ করছে? আজ তিনচার দিন সৌরভী রাগ করে মা'য়ের বাড়ী পালিয়েচে। কাল সারারাত

হাঁটাহাঁটি ক'রেও তাকে আন্‌তে পারি নি।......আজ আর কাছারী যাবো না,—এক্ষুণি রওনা হ'তে হবে।

—কোথা?

—সৌরভীর মায়ের বাড়ী। আজকে আস্‌বে ব'লে কথা দিয়েচে। যদি না যাই, তা হ'লে রেগে আগুন হ'য়ে উঠ্‌বে।

নন্দলাল উত্তেজিত হইয়াই, মুহূর্ত্তে মনোভাব সংবরণ করিয়া লইল। বলিল—রাগ ভাঙানোর ঢের সময় পাবে খুড়োঠাকুর, কিন্তু আর মাথাখুঁড়ে মরলেও আজকের দিনটুকু ফিরে পাবে না। কিশোরী দিদি শুধু তোমার ভরসাতেই এখনো বেঁচে আছে।

পশুপতি ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন—কিন্তু আমার তো এখন সময় হবে না বাপু! যে লোকের পয়ে আমি দশজনের কাছে দাঁড়াতে পারি, সেই সৌরভী যদি রাগ করে এ মুখো না হয়, তাহ'লে আমার তো যা হবার তা হবেই, ভবিষ্যতে কিশোরীও খেতে পাবে না। তা ছাড়া বয়েস হ'ল কত,—এর পর তার বিয়ে থা দিতে হবে।

নন্দলাল গম্ভীর হইয়া কহিল—তবু তোমার আক্কেল আছে ঠাকুর! —এখনো ভুলে যাও নি যে, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, বাপ্‌কেই ভাবতে হয়।......কিন্তু আজ যে খুড়ীঠাক্‌রুণের ছেরাদ্দ—সে কথাটা মনে নেই বুঝি?......লোকে বলে সৈরভী কামারের মেয়ে, কিন্তু আমার মনে হয় —সে মোছলমান। তা নইলে—হিঁদুর চাল চলনটুকুও তোমাকে ভুলিয়ে ছেড়েচে!......নাও—চলো!—বেলা হচ্ছে।

পশুপতি বলিলেন—তোমরা তো পাঁচজনে রয়েচ নন্দলাল! যাতে

যা.হয় করো। আমি এখানেই কাশিয়ে মাথা ডুবিয়ে আস্‌বো।......
সৌরভীর না আসা পর্য্যন্ত আমি একটুও স্থির হ'তে পারবো না। মন
ভাল না থাকলে কি কোথাও যেতে ভাল লাগে বাবা ?

নন্দলাল বলিয়া উঠিল—সৈরভী তোমার সাতপুরুষের ইষ্টি গুরু।...
পরিবারকে তো না খেতে দিয়ে থেঁত্‌লে মারলে, একটা পিণ্ডি পেলে
যদি পরকালে তার গতি হয়,—তা-ও তোমার সময়ে কুলোয় না! কিন্তু
নন্দগয়লার পষ্ট কথা শুনে রাখো ঠাকুর!—যেখানেই যাও, আর
চামাড়-মেথর-বাগ্দী-মোচলমান যাকেই ইষ্টিগুরুর মতন মাথায় করে
ব'য়ে বেড়াও, আজ কিন্তু গাঙ্গলপুরে তোমাকে যেতেই হবে।—না
গেলে দিদি আমার বাঁচবে না।—আমি জোর গলায় তাকে বুঝিয়ে
রেখে এসেচি—যেমন করে পারি—খুড়োঠাকুরকে আন্‌বোই।...এখন
বলো কি করবে ?

পশুপতি চিন্তান্বিত হইলেন।

নন্দলাল বলিল—দারোগাবাবুর হুকুমটাও অম্‌নি মনে করে দেখ।
তিনি যা ব'লেছিলেন—একটা কথাও মান্যি করনি। আজ যদি না
যাও, আমি থানায় গিয়ে বিধি চাইবো। তোমার ধম্মে না হয়, দারোগা-
বাবুর ধম্মে নিশ্চয়ই বিচার পাবো।

পশুপতি বলিলেন—আচ্ছা,—তাই হবে। তুমি এগিয়ে যাও,
কিশোরীকে গিয়ে বলো—আমি আস্‌চি।

নন্দলাল হঠাৎ পশুপতির পায়ের গোড়ায় হাত রাখিয়া বলিল—
মাপ করো খুড়োঠাকুর!—তোমার চরণ ছুঁয়ে দিব্যি করছি,—আমি
একতিলও তোমাকে বিশ্বাস করিনে। জাত গয়লা নন্দলালের যদি

নরক বাস হয়, হোক্,—আপন ইচ্ছেয় না যেতে চাইলে, তোমার হাত-পা বেঁধে, কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে যাবো।

পশুপতির বলিবার মত, সাফাই গাহিবার মত কোন কিছুই আর পুঁজি ছিল না। বিশেষতঃ দারোগাবাবুর নামে তাঁর মনের মধ্যে এতটুকুও চাতুরী খেলিবার শক্তি আসিল না। বলিলেন—চলো যাচ্ছি। কিন্তু তুমি আজ আমার মহা সর্ব্বনাশ করে চ'ল্‌লে বাপু!......আমাকে ধনে প্রাণে মেরে দিলে।

হাসিয়া নন্দলাল কহিল—অপরাধ নিয়োনা ঠাকুর!—তোমার না বাঁচাই মঙ্গল। এতকাল ধ'রে যা করে এসেচ, আজ তার যা কিছু পারো প্রাশ্চিত্তি করো। আমি মুখ্যু গয়লার ছেলে, তবু বলি—জেনে রেখো—মাথার ওপর একজন আছে।...তোমাকে খোসামুদী করবার এতটুকু লোভ নেই আমার। আজ থেকে, কিশোরী দিদির ওপর বাপ হ'য়েও যদি দরদ না দেখাও, তাহ'লে খাতির করা চুলোয় যাক্,—খুন করতেও পেছ্‌পা হবো না আমি। এতদিন খালি কিশোরী দিদির কথাতেই কিছু বলিনি। এবার থেকে তার কথাও আর শুনবো না। যদি শুনি, তাহ'লে দুশোবার আমার অধর্ম্ম হবে।

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, পশুপতি কহিলেন—কিন্তু সৌরভী আমার ভাগ্যলক্ষ্মী, তার বরাতেই—

—চোপ্!......

পশুপতি ভীত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—আচ্ছা বাবা! চলো!—কিন্তু বিকেল বেলাতেই আমায় ফিরে আস্‌তে হবে। ঘর-বাড়ী সব প'ড়ে রইলো। গিন্নী নেই—

—আবার !......গিন্নী নেই......তোমার শাস্তি হচ্ছে—তলে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে মাটীতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা। বলিতে বলিতে হঠাৎ কিশোরীর পিতৃভক্তির কথা স্মরণে আসিল। অমনি নরম হইয়া নন্দলাল পশুপতির পদধূলি লইতে লইতে বলিল—বামুনকে কুকথা বলার দোষ, এই ক'রেই খণ্ডন করলাম।...এইবার চলো খুড়োঠাকুর !... তারা পথ চেয়ে ব'সে রয়েচে।
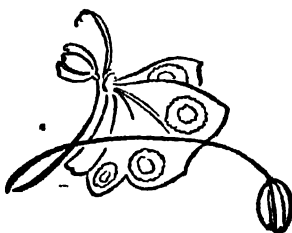
সপ্তম পরিচ্ছেদ

"সহিতে দহিতে জনম মম
কে আছে অভাগী আমারি সম...

বাড়ীতে ধুমধাম্,—লোকজনের আসা-যাওয়ার বিরাম নাই। সিধু-ঠাকুর পুরাদমে মন্ত্র পড়াইতেছিল। কিশোরী মাতার শ্রাদ্ধ করিতেছে।

নন্দলালের পশ্চাতে পশ্চাতে অবিকল চোরের মতই পশুপতি চাটুয্যে তাঁহার আপন গৃহপ্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। যৌবনের প্রথম সন্ধিক্ষণে যে অভাগিনী নারীর সকল ভার মাথা পাতিয়া লইবার সময় জ্বলন্ত হোমানলে আহুতি দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন—'যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব'—আজ সেই মহাবাক্যের কতটুকু মর্য্যাদা তিনি পালন করিতে পারিয়াছেন,—এই অনুশোচনার বিকাশ অন্তর মধ্যে আসিয়াছিল কি না,—তাহা তাঁর অন্তর্যামীই বলিতে পারেন না!—অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী—সুখদুঃখভাগিনী যে নারী, আজীবন শত দুঃখের মাঝেও হাসিমুখে স্বামীর মঙ্গল ছাড়া ভগবৎপদে দ্বিতীয় প্রার্থনা জানায় নাই, আজ তাহারই শ্রাদ্ধবাসরে হাজির হইয়া পশুপতির প্রাণে আত্মগ্লানি আসিল কি না—সে খবর কে বলিবে?

রামী ছিল সকল দিকের সকল রকম ভার মাথায় করিয়া। পশুপতিকে

দেখিতে পাইয়াই, সে তাড়াতাড়ি পা ধুইবার জল ঠিক করিয়া দিল। দাওয়ায় বসাইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

সিধুঠাকুর অনেক ভাবিয়া, সকলের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করিয়াই শ্রাদ্ধে পৌরহিত্য করিতে আসিয়াছে। না আসিলে যে সর্ব্বনাশ হইতে পারে,—ইহাও সে এবং গ্রামের অনেকেই নিশ্চিত জানিত। যে হেতু নন্দলালের গোঁড়ামীকে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই, বিশেষতঃ স্বয়ং রামীও চীৎকার করিয়া জানাইয়াছিল—গাজলপুর ধু ধু করে জ্বল্‌বে।......

মন্ত্র পড়াইতে পড়াইতেই এক ফাঁকে সিধু কহিল—পশুপতির কি ক্ষৌরকর্ম্ম হয় নি?...সে কি হে?...যাও শীগ্‌গীর! ছি ছি এ আক্কেলটাও রাথ্‌তে হয়......

পশুপতি বাস্তবিকই এইবার অপ্রতিভ হইলেন। সিধু ঠাকুরের কথার উত্তর না দিয়াই তিনি স্নানের ঘাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন দেখিয়া, নন্দলাল কহিল—দাঁড়াও খুড়োঠাকুর!...আমাদের বাড়ীখানা একবার দেখে এসেই তোমার সঙ্গে যাবো।

সিধু কহিল—তুমি যাওনা বাড়ী। ও ততক্ষণ কাজ সেরে ফিরে আস্‌বে।

তাড়াতাড়ি নন্দলাল বলিল—না না,—ফিরে আস্‌বে কে ব'ল্‌লে?... খুড়োঠাকুর পালিয়োনা যেন। একলা আজ কিছুতেই ছাড়বো না তোমাকে।

সমাগতদের অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

তখন কিশোরীর দুটি চক্ষু অশ্রুর ভারে টলমল করিতেছিল। হাজার হোক্—তবু সে কন্যা, আর পশুপতি তার জন্মদাতা পিতা।

...নন্দলাল কিন্তু সত্যসত্যই পশুপতিকে একলা ঘাটে যাইতে দিল না। সে নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে যথা কর্ত্তব্য সম্পাদন করাইল।

* * * রামী ও নন্দলালের ঐকান্তিক যত্ন-পরিশ্রমে গ্রামের সকলেই পরিতৃপ্তির সহিত মধ্যাহ্নভোজন সমাপনান্তে গৃহে ফিরিলে, রামী পশুপতির আহারের ঠাঁই করিয়া দিয়া, কিশোরীকে খাবার দিতে বলিল। তখনও পাড়ার কেহ কেহ উপস্থিত ছিল।

নন্দলাল কহিল—গাঙ্গলপুর থেকে সহর তো বেশী দূর নয় খুড়ো-ঠাকুর, তুমি সহরের বাসা উঠিয়ে দাও। কাল থেকে কিশোরী দিদি কাছারীর ভাত রেঁধে দেবে, দিব্যি আরামে খেয়ে, আস্তে আস্তে যেয়ো।

আহারে বসিয়া পশুপতি বলিলেন—যা হয় হবে।...কিন্তু বিকেলের ঝোঁকে একবারটি বাড়ীখানা দেখে আস্‌বো। জিনিষপত্র প'ড়ে রয়েচে।

নন্দলাল কহিল—থাক্ না। আমিই দেখে আস্‌বো এখন। যদি হুকুম করো—বরং রাত্তিরটাও সেখানে হাজির থেকে, তোমার জিনিষপত্তর পাহারা দেবো। কিন্তু সত্যি কথা ব'ল্‌চি,—তোমাকে আর সে মুখো হ'তে দিচ্ছি নি ঠাকুর! এ আমাদের তিন ভাইবোনের এক যুক্তি।

পাড়ার যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারাও একবাক্যে নন্দলালের যুক্তিটাই সমীচিন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। কিন্তু ভবি ভুলিবার নয়, পশুপতির সেই এককথা—'বিকেলে একবারটি যেতেই হবে।'

কিশোরী একান্ত নম্রভাবে বলিল—তাই যেয়ো বাবা!......ব'কে ব'কে তোমার খাওয়া হ'ল না যে। বলিতে বলিতে কাছে বসিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল।

পশুপতি আপন মনে আহার করিতেছিলেন, পিতৃগত-প্রাণা জন্ম-

কাঙালিনী কন্যার প্রত্যাশী মুখখানায় যে কি ভীষণ ঝড় বহিতেছিল,—
একবার চাহিয়াও দেখিলেন না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে, নন্দলালের একান্ত অনিচ্ছায়, কিশোরী বলিল—
রাত্তিরে কি এ বাড়ীতে থাক্‌বে না বাবা? সহরে যেতেই হবে?

পশুপতির মনটুকু কন্যার স্নেহমমতা লক্ষ্য করিয়া দ্রব হইয়াছিল
কি না,—সঠিক জানা গেল না। কিন্তু নম্রভাবেই তিনি বলিলেন—
ঘরবাড়ী খাঁ খাঁ করছে মা!......যদি চোর ডাকাতের নজর পড়ে, তা
হ'লে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে।

কিশোরী হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মাথা নত করিয়া বলিল—কাল
সকালেই আবার আস্‌বে তো?......তারপর ধরা গলাটা পরিষ্কার করিয়া
লইয়া পুনরায় কহিল—আমার আর ভূভারতে কেউ নেই বাবা! যতদিন
মা বেঁচে ছিল, যা হোক্ করে চ'লে গেছে, কিন্তু এখন থেকে......

পশুপতি কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—ভয় কি মা!
নন্দলাল থাক্‌তে তোমার কোনো বিপদ হবে না। ওকে যেন চটিয়ে
দিয়ো না। তা ছাড়া আমিও আস্‌বো।

কিশোরী খুব ভয়ে ভয়ে ভয়ে কহিল—কাল সকালেই এসো বাবা!...
আমাকে আর পায়ে ঠেলে দূরে রেখ না। আমি বড্ড হতভাগী!...যখন
সাপের কামড়েও মরণ হয়নি, তখন বুঝ্‌তে পারছি—সহজে মরবো না।
কিন্তু বাঁচ্‌তে গেলে খাওয়া-পরা-ভয়-ভাবনাকে তো ছাড়লে চলে না
বাবা!......তা ছাড়া বাপ্ থাক্‌তে, মেয়ে হ'য়ে, কেমন ক'রে রোজ
রোজ স্বামীর কাছে সাহায্য চাইবো?......তোমার মেয়ে হ'য়ে, ভিক্ষের
ঝুলি কাঁধে বেরুলে কি তোমারই মাথাটা উঁচু থাক্‌বে বাবা?

পশুপতি ভাবিতে ভাবিতে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। কন্যার অন্তর বেদনার কথা চিন্তা করা দূরের কথা,—তার বিবর্ণ মুখখানাও একবারটি লক্ষ্য করিয়া গেলেন না।

নির্জ্জন প্রাঙ্গনের ধূলায় লুটাইয়া কিশোরী অপমানাহত বুকখানাকে দাবিয়া বড় কান্নাটাই কাঁদিল। ধনজন-বৈভবপূর্ণ বসুন্ধরার বুকে, আজ সে সকল রকমে কাঙাল—একান্তই অনাথা! পথ-ভিখারীর চেয়েও রিক্ত!

অভিশপ্ত অদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে অলক্ষ্যে কখন সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে, কিশোরী একটুও টের পায় নাই। যখন টের পাইল তখন অনেকখানি রাত্রি হইয়া গেছে।—আজ আর সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেও তার ইচ্ছা হইল না। কিসের জন্যই বা জ্বালিবে?—অন্ধকারের অন্তরে যে জমাট বাঁধা অশ্রুর ভাণ্ডার গোপন করা ছিল, আজ সবটুকুই নিঃশেষে যেন তাহারই চোখের কোণে জমায়িত হইয়া গেছে! মনোমন্দিরের সোপান-চত্বরে ভবিষ্য-দুঃখের দামামা বাজিতে-ছিল,—অন্তর্যামী দেবতা মানুষের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া রোদন করিতেছিলেন—এই যে খেদ-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মাথায় মাথায় গরলের উৎস উত্থিত হইয়াছে,—এমন চিরসহিষ্ণু সদাশিব কে আছে,—যে বিশ্বের শিব-কামনায়, কণ্ঠায় কণ্ঠায় তাহা পান করিয়া বিশ্ববাসীকে অমৃত উপহার দিতে পারে?

কিশোরীর কণ্ঠ ঠেলিয়া রোদনের সাড়া আসিতেছিল—বাবা! বাবা!—জন্ম দিয়েছিলে, আজ পালন করার ভার নিলে না কেন? চরণের তলায় আমি এতই কি অপরাধ করেছি, নয়নাশ্রুতে লক্ষ দরিয়া তৈরী করলেও তার মার্জ্জনা পাবো না?...ওগো নিষ্ঠুর জনক! ওগো

মমতাবিহীন দেবতা!—অযুত জনমের লক্ষ লক্ষ পুণ্যবিনিময়ে, আজ দীনা তনয়াকে স্নেহ-ভিক্ষা দাও! একবিন্দু স্নেহ—এতটুকু! তোমার স্নেহহারা হ'য়ে একদণ্ডও বেঁচে থাকার সাধ নেই আজ!

ইহারই মধ্যে আকাশে মেঘ জমিয়া, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নামিয়াছে—কিশোরী লক্ষ্য করে নাই। যখন টের পাইল, তখন সর্ব্বাঙ্গ তার অর্দ্ধসিক্ত হইয়া গেছে।......

উঃ কী ভীষণ ঘুট্‌ ঘুটে আঁধার!—ভগ্ন গৃহ-প্রাঙ্গণের কাদায় দেহখানা মাখামাখি হইয়া গেল—তবুও কিশোরীর একবিন্দু সামর্থ্য নাই যে উঠিয়া যায়। সমস্ত দিনের অনাহার, দারুণ দুশ্চিন্তার জ্বালা—দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে শক্তিহীন করিয়া দিয়াছে—আজ আর বিশ্বনাথের দরবারে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু চাহিবার আকাঙ্ক্ষা নাই।

একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে রামী আসিয়া আঙিনাতেই কিশোরীকে লুণ্ঠিত দেখিল। সান্ত্বনা দিবে কি,—বেচারী নিজেই কথা কহিতে পারে না!......নারায়ণ!—ভাণ্ডারে তোমার যত দুঃখ কষ্টের স্তূপ সঞ্চিত ছিল, সবই কি এই অভাগিনীর অভিশাপ-দগ্ধ অদৃষ্টের জন্য? ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা হইয়া, এ তোমার কী সুবিধান?

স্নেহমিশ্রিত ভৎসনার সুরে রামী কহিল—ঘরে কি একগাছা ছেঁড়া দড়িও তোর ছিল না কিশোরী?—গলায় বেঁধে মরতে পারিস নি? এর চেয়ে যে মরণই মঙ্গল ছিল।

কিশোরী উঠিয়া বসিল। কহিল—হয়তো তাই ছিল রামী! কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভাই! হাড় কখানা রেণু রেণু হ'য়ে ধূলোয় মিশে যাক—তবু

অন্ধতমসাচ্ছন্ন রজনীতে—কিশোরী!
(পিতার অসুস্থ সংবাদ পাইয়া)।

সহ্যের, কিন্তু মরবার সাহস সকল সময় মানুষের আসে না। তবে মরতে পারলেই আজ বেঁচে যেতাম রামী!...এ যে বড় জ্বালা! সহ্য করি কেমন করে?

রামী অন্য কিছু না বলিয়া, কিশোরীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল—নাও ওঠো! মন বোঝে না তাই ঘুরে ঘুরে তোমার কাছেই মরতে আসি!...সারাদিন পেটে জলবিন্দু পড়েনি, মরবারই তো দাখিল হ'য়ে রয়েচ। ঘরে চলো—

কিশোরী রামীর কাঁধে ভর দিয়া, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং একটিও কথা না কহিয়া ভূমি-শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। আহার অপেক্ষা সুনিবিড় বিশ্রামেরই প্রয়োজন তার অধিক হইয়াছে।

কিন্তু রামী কোন মতেই ছাড়িল না—আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

কিশোরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—কতদিন এম্‌নিভাবে চ'লবে রে?—বাবা পায়ে ঠেলে ফেলে চ'লে গেলেন, তোরা আর কতদিন খাইয়ে পরিয়ে বাঁচাবি আমাকে? পিপাসা পেলে যাকে জল খাওয়ার জন্যে ঘাটে ছুট্‌তে হয়, তাকে বাঁচিয়ে রাখার ভার নেওয়া তো যেমন তেমন ব্যাপার নয় গয়লাবউ!...আমার কপাল নিয়ে আমিই ভুগ্‌বো, কাল থেকে তুই আর আসিস নি রামী! নন্দ দা'কেও বারণ করে দিস্‌।

রামী কহিল—এ আর নতুন কথা কি ব'লছো দিদিঠাক্‌রুণ! দুনিয়ার নিয়মই এই। পর কি কখনো আপনার হ'তে পারে? নইলে তোমার পা দুটো চোখের জলে ধুইয়ে দিয়ে কত দিনই তো ব'লেছি—রামী গয়লানীর অভাব কিসের? তার তিন কুলে আছেই বা কে?...

বামুন-কন্তের একমুষ্টি পেটের ভাত, সে কি এতই অভাব হবে দিদি?... বেশ তোমার যুক্তি তোমারই থাক্। যদি বারণ করো, কেন আস্‌বো? —ছোড়দাই বা ঘণ্টায় ঘণ্টায় অপমান সইতে কি জন্যে হাঁটাহাঁটী করবে? মন বোঝে না ব'লেই তো—বেহায়ার মতন আসি যাই! নইলে আমাদের কি?...বলিতে বলিতে স্বামী কাঁদিয়া ফেলিল।

কিশোরীর মুখে, শত দুঃখের মাঝেও, ঘন অন্ধকারে বিজলী চমকের মতই এক টুক্‌রা হাসি দেখা দিল। কহিল—দে ভাই দে!—কি খাওয়াবি দে! সত্যিই আমি অবুঝ স্বামী, নইলে বাপ কখনও পায়ে দ'লে পালিয়ে যায়?...কত কথাই না জান্‌তাম, কিন্তু বাবাকে বুঝিয়ে বল্‌বার মত কোন কথাই আমি শিখ্‌তে পারি নি দিদি!

তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। উঠানে দাঁড়াইয়া সিধু চক্রবর্ত্তী হাঁকিল—পশুপতি কি করছো হে? খাওয়া হ'য়েচে?

কিশোরী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া বলিল—বাবা তো নেই দাদামশায়! বিকেল বেলাতেই চ'লে গেছেন।

সিধু চক্রবর্ত্তী বাস্তবিকই বিস্মিত হইল। কহিল—বলিস কি রে? চ'লে গেছে? তুই কেন বল্‌লিনি—আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছো? ...ছি ছি...নেহাৎ পশু!

কিশোরী বলিল—দরকার আছে, তাই থাক্‌তে পারলেন না। কাল বোধহয় আসবেন। সেখানকার ঘর বাড়ীও দেখা চাইতো?

একটা তীব্র শ্লেষের ভঙ্গীতে সিধু বলিল—কামারের মেয়েকে লক্ষ্মী সাজিয়ে যে সংসার তৈরী, তা বাড়ী-ঘরই বটে! কিন্তু তুই আর বাপের ভরসা রাখিস্‌নি দিদি!...মা গেছে, বাবাও তোর যাওয়ার মধ্যেই—

তীব্র ভর্ৎসনার সুরে কিশোরী বলিল—রাত দুপুরে গালাগালি দেবেন না দাদামশায়! বাবা ছাড়া আমার যে কেউ নেই আর।... আশীর্ব্বাদ করুন—বাবা আমার সুখে থাক্।

সিধু নাক সিট্‌কাইয়া, ঘরের মধ্যে ঢুকিল। বসিবার আসন ছিল না, একখানি চ্যাটাই পাতিয়া দিয়া, কিশোরী বলিল—রামী আছে, নন্দ দাদা আছে, আপনারা রয়েছেন, আমার ভাবনা কিসের দাদামশায়! ...বাবাকে দোষ দেওয়াটা আমি পছন্দ করবো না কিন্তু।

সিধু বিরক্ত হইয়া বলিল—তুমি তো পছন্দ করবেই না। বাপের আদরের দুলালী কি-না! কিন্তু দেশের লোকজন যে মোটেই তা মানতে চাইবে না।...পশুপতিকে ব'লে পাঠাস কিশোরী!—ভাদ্র-আশ্বিন-কার্ত্তিক—এই তিনটি মাস পরেই যেন তোর বিয়ে থা দেয়। নইলে গাঁয়ে ঘরে অনাচার চ'ল্‌লে আমরা তা সইতে পারবো না।...পাড়ায় অনাথার মতন বাস করিস, মমতা হয় ব'লেই সময় অসময় মানিনে—ভাল কথা শুনিয়ে দিই।

রামী গাজনপুরের বধূ, সুতরাং সিধু চক্রবর্ত্তীর সহিত মুখোমুখী কথা কহিল না। নতুবা এই সময় দু কথা শুনাইয়া দিবার অদম্য বাসনাকে সে কোন রকমেই দাবিয়া রাখিতে পারিত না।

সিধু বলিতে লাগিল—ভুলিস নি কিশোরী, বাপকে ব'লে পাঠাস্—বিয়ে না দিলে পাড়াগাঁয়ের বাস উঠিয়ে তোকে যেন সহরবাসী করে। ...ঘরে ঘরে অনাচার—এ কি ভাল? আর পশুপতি যদি গায়ে না করে, তা হ'লে আমরাই পাঁচজনে কিছু কিছু চাঁদা তুলে শুভকাজ শেষ ক'রে দেব।...এ তো মন্দ কাজ নয়, বামুনের কন্যাদায়।

এম্‌নি সময় হাজির হইল—নন্দলাল।

সিধু ঠাকুরের শেষ কথাগুলি সে শুনিতে পাইয়াছিল। বলিল—কন্যাদায় পরের কথা, আগে পেটের দায় থেকে নিশ্চিন্দি হোক্ ঠাকুর। জোর জুলুম কি যখন তখন মানায় চকোত্তি মশায়?

সিধু ঠাকুর নন্দলালের ভয়েই কিশোরীর সঙ্গে আত্মীয়তা দেখাইতে আসিয়াছিল। ঐ যে সে দিন স্বামী উঁচুগলায় জানাইয়াছিল—'গাজন পুর ধূ ধূ ক'রে জ্বলবে'—তখন থেকে তাহার মনে শান্তি ছিল না। দুষ্টকে সকল লোকেই দূর হইতে নমস্কার জানায়। ভক্তি ভালবাসা না থাক্ ভয়টুকু যখন তখনই মনের মাঝে খোঁচা দিয়া যায়।

নন্দলালের কথার জবাবে সিধু চক্রবর্ত্তী কহিল—জোর জুলুম কোথায় আবার নন্দলাল? হিত তাকালেও যদি জোর জুলুম ভাবো, তা হ'লে আর আস্‌বো না।...বিয়ে না হ'লে সমাজ শুন্‌বে কেন?

চটিয়া নন্দলাল বলিল—দেখ ঠাকুর! আমি জাত গয়লা, ঘোল আমার ঘরে হাঁড়ি হাঁড়ি মজুত থাকে, ফের যদি ভণ্ডামী সুরু করো, তা হ'লে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢাল্‌বো। সমাজ!......সমাজ আবার কি আছে তোমাদের?...

এবার সিধু চক্রবর্ত্তী ভয়ানক রাগিয়া উঠিল। ডান হাতখানা নন্দলালের মুখের কাছে নাড়িতে নাড়িতে কহিল—তুই ব্যাটা গয়লার পো, বামুনের সমাজ বুঝিস্? তোর অধিকার কি—এই নিয়ে কথা কইবার? জানিস পাপ হবে?

নন্দলাল লাঠি ছাড়া এক পা চলে না। বাঁ হাতের লাঠি ডানহাতে লইয়া বলিল—পাপ-পুণ্যির ধার ধারিনি আমি। কিন্তু অন্যায় দেখলেই

লাঠির ঘায়ে আক্কেল দিয়ে দেব।...তা বেশ তো চক্কোত্তি মশায়,—দিদি ঠাকরুণের বিয়েটা যদি তোমাদের যোগাড়ে সমাজ থেকেই হ'য়ে যায়—তবে লাগিয়ে দাও না। যদি দিতে পারো, তা হ'লে দুশোবার স্বীকার করবো যে, তোমাদের বামুন জাত বিধি ব্যবস্থা জানে। কিন্তু মনে রেখ ঠাকুর!—পশুপতি চাটুয্যের মতামত চাইলে চ'লবে না।

সিধু কহিল—আরে বাপু! লাফাচ্চো কেন? এই তো রাখু ঘোষাল কিশোরীর আশে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েচে। 'হুঁ' করলেই টোপর মাথায় হাজির হবে। বাঙলাদেশে, মেয়ের বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামায় কে? . ... তুমি বাপু একটুখানি বুঝে-সুঝে, তোমার ঐ দিদিঠাকরুণটিকেও ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিয়ো। মোট কথা কিশোরী যদি মত দেয়, আমি পশুপতির নাম মুখেও আন্‌বো না। নিজে মাথা হ'য়ে দাঁড়িয়ে শুভকাজ শেষ ক'রে দেবো।

নন্দলাল বলিল—রাখু ঘোষাল?—সে তো কাণা!—দুটো চোখই কাণা! বাঁ পা খানা বাতে পঙ্গু হ'য়ে গেছে!

সিধু কহিল—কিন্তু ব'য়েস কম। মোটে ত্রিশ কি বত্রিশ।

নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল—ঘোষাল মশায় বিয়ে ক'রে, বউকে কি খাওয়াবে?......রোজ তো দেখি পেমা বাগ্‌দীর কাঁধ ধরে ধরে আমাদের গোয়ালবাড়ী থেকে একসের আধসের দুধ চাইতে আসে। বলে—চা খাবো বাবা!......আরে মশায় গয়লা হ'লেই কি তাকে নির্ব্বোধ ব'লতে হবে? এক সের দুধের চা?......কিন্তু একটা কথা শুনে রাখো চক্কোত্তি মশায়!—তোমরা পাঁচজনে কিশোরী দিদিকে যে দস্তুর মতন ভাল বাসো আমি তা মেনে নিলাম, কিন্তু বেশী দরদ দেখিয়োনা। রাখু ঘোষালের

যদি টোপর মাথায় দিতে সাধ হ'য়ে থাকে, তো সে অন্য জায়গায়, এখানে নয়।

সিধু কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করিল—কি রে তোরও কি এই কথা?

কিশোরী কঠোর হইয়া উঠিল। বলিল—আমি দেশের লোকের কী করেছি যে, সময় নেই অসময় নেই—আপনারা যখন তখন অপমান করে যাবেন?......এখনো তো হাতযোড় করে ঝুলি কাঁধে ভিক্ষেয় বেরুইনি।

সিধু ক্রুদ্ধ হইল না। গম্ভীর ভাবে বলিল—ঐটুকুই শুধু বাকী আছে। কিন্তু বুঝে দেখ্ এর চেয়ে ঝুলি কাঁধে নিলে বিন্দুমাত্র মান যায় না। গয়লা বাড়ীর ভাতে পেট ভরানোর চেয়ে, বামুনের মেয়ের ঝুলি কাঁধে ভিক্ষে করায় ঢের বেশী ইজ্জৎ থাকে।

হঠাৎ রামী মুখের ঘোম্‌টা খুলিয়া, সিধু চক্রবর্ত্তীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বলিল—আপনারা তো র'য়েচেন, ক'দিন খোঁজ নিতে আসেন? সাপের কামড়ে মরতে ব'সেছিল, ঘরে দোর দিয়ে শুয়েছিলেন, একবাটি বেরিয়ে এসেও 'আহা' ব'ল্‌তে পারেন নি! উল্‌টে কতকগুলো বিশ্রী কথা রটিয়ে পাড়ার লোকের কাণভারি ক'রে মজা দেখেছিলেন। গয়লাদের কপাল মন্দ তাই কিশোরী দিদি তাদের সাহায্য পায়ে ঠেলে দেয়। নইলে দেখ্‌তে পেতেন,—আপনাদের মত দু'দশজনকে ও একহাটে কিন্‌তে বেচ্‌তে পারতো।...কিন্তু মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বাজে কথাকে গুরুতর করতে গেলে গয়লারা তা সইবে না। কিশোরীকে অনাথা ভেবে, আর কোন দিন যদি দরদ দেখাতে আসেন, তা হ'লে দরদী হ'য়েও অপমানিত হবেন।

সিধু কি একটা বলিতে যাইতেছিল, নন্দলাল বাধা দিয়া কহিল—

কথা বাড়িয়োনা ঠাকুর! জানোই তো—স্বভাবে আমার চোরের লক্ষণ—অতি ভক্তি নেই। একটু আগে রাখু ঘোষালের নাম করলে না?—ঠিক তার মতই কাণা করে ছেড়ে দেব। পা দুটো লাঠির ঘায়ে—

কাণে আঙ্গুল দিয়া সিধু উচ্চারণ করিল—রাম রাম রাম! উচ্ছন্নে যা ব্যাটা গয়লা! নরক হোক! নরক হোক্!

হা-হা শব্দে নন্দলাল উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

রামী কহিল—মুখ থামাও ছোড়দা! নইলে সত্যি সত্যিই নরক হবে। যতই হোক্—বামুন তো।

মিনতির সুরে কিশোরী বলিল—আপনার পায়ে পড়ি দাদামশায়! —আর না খুব হ'য়েচে, এইবার বাড়ী যান।

সিধু সত্য সত্যই চলিয়া গেল কিন্তু যাইতে যাইতে বলিল—কপালে তোর বিস্তর দুঃখু আছে কিশোরী! সমঝে চলিস। সিধু চক্কোত্তি দশ খানা গাঁয়ের পূজো পেয়ে আস্‌চে, সে ছোট লোক গয়লার অপমান হজম করবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—"কেন এসেছিলে—কেন চ'লে গেলে,
রেখে গেলে—এঁকে চরণ রেখা !"

ভোর হইতে না হইতেই নন্দলাল রোজকার মত কিশোরীর সংবাদ লইতে আসিয়া নির্জ্জন বাড়ীর প্রাঙ্গনে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল! হায় হায় আজ তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেছে!—তাহাদের বড় আপনার কিশোরী দিদি আজ কোথায় গেল? তাহাদের সকলের প্রাণঢালা স্নেহ-মমতা-ভালবাসার বাঁধন হেলায় ছিন্ন করিয়া, হতভাগিনী আজ কোন্ পুরীতে শান্তির আশায় ছুটিয়া পলাইল? পাথরের তৈরী শক্ত এই বুক-খানার মাঝে, মহা মূর্থ নন্দলাল এ দুর্ব্বিসহ শোক কেমন করিয়া সহিবে আজ? মার পেটের বোন্ একান্ত স্নেহাশ্রিতা রামীর চেয়ে কিশোরীকে যে একতিলও ছোট করিয়া ভাবে নাই সে!—ভগবান! ভগবান! এ কী বজ্রাগ্নির ব্যথা জ্বালিলে আজ!

বাহ্যজ্ঞান ছিল না, নন্দলাল চোখের জলে বুক ভাসাইয়া রোদন করিতেছিল। নিত্যকার অভ্যাসমত রামীও কিশোরীর বাড়ীতে আসিয়া, কিশোরীকে দেখিল না, দেখিল—সর্ব্বহারা কাঙালের বেশে আঙিনায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছে—তাহার ছোড়দা—নন্দলাল!

রামীকে দেখিয়া নন্দলাল চীৎকার করিয়া উঠিল—নাই রে, সে আর

নাই! যত্ন জানিনি, আদর করতে শিখিনি, তাই বুঝি দিদি আমার অভিমানে পালিয়ে গেছে। ওরে রামী, নন্দগয়লা এমন করে তো কারুকে মায়া দেখায় নি, তবু কেন দিদি আমার না ব'লে পালালো?

রামী কিন্তু একবারও কাঁদিল না, একবিন্দু চোখের জল ফেলিল না। চোখ দুটি তার শুষ্ক—যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতেছে।...কিছুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া বলিল—কেঁদে কেঁদে তো তাকে পাবে না ছোড়দা! উঠে আমার সঙ্গে চলো। আমি আজ দেখ্‌বো—গাজলপুরের লোকে কত বড় শয়তানি শিখেচে।...এ আর কারুর কাজ নয়, সিধু ঠাকুর পাণ্ডা সেজে, গাঁয়ের লোক দিয়ে তার সর্ব্বনাশ করেছে। হয়তো মেরে কোন্ পুকুরের জলে ডুবিয়ে ফেলেচে।

কিন্তু কোন স্থানেই যাইতে হইল না। আসামী সিধু চক্রবর্ত্তী নিজেই আসিয়া হাজির হইল।

নন্দলাল হুঙ্কার দিয়া উঠিল—বামুনের দেবতাগিরি আর মান্‌বো না ঠাকুর! একের পাপে দশজনে ভুগ্‌বে। গাজলপুর পুড়িয়ে ছারখার করবো—আমি দ্বীপান্তরে যাবো। নইলে শীগ্‌গীর বলো—কিশোরী দিদিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেচ?—সে বেঁচে আছে কি না—

সিধু অতিশয় বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—কি ব'লছো তুমি নন্দলাল?—কিশোরী কোথায়? ভগবানের দিব্যি, আমি কিচ্ছু জানিনে।

নন্দলাল উত্তেজিত হইয়া বলিল—ভগবানের নাম মনে আছে ঠাকুর? এখনো তার নাম তোমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে? বলো তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেচ?

সিধু হাতে যজ্ঞোপবীত জড়াইয়া কাতরকণ্ঠে কহিল—দিব্যি করছি বাবা নন্দলাল! গরীব বামুন আমি, কিচ্ছুটি জানিনে।

রামী কিন্তু মোটেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। কহিল—ভাঙা ঘরের কোণে, ছেঁড়া আঁচল বিছিয়ে, পেট কোলে করে প'ড়ে থাক্‌তো, তবু পরের দোরে হাত পাত্‌তে যেত না। এত বড় উঁচু স্বভাব তার! তাকে বেঘোরে মারলে শাস্তির বোঝা যেমন তেমন হবে না ঠাকুর!...আর যদি একবারে শেষ করে ফেলে থাকো, তা হ'লে এখন থেকে খুলে বলো—অভাগীর মরা দেহটা নিয়ে এসে সৎকার করি। বলিতে বলিতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত রোদনের সুরে কহিল—দিদি আমার! জীবনে একটা দিনও সুখ পাস্‌নি। শেষকালে প্রাণটাকেও বেঘোরে হারালি ভাই!......ওরে কিশোরী! কেন কথা শুন্‌লি নি? কেন জেদ বজায় রাখ্‌তে গিয়ে আপন সর্ব্বনাশ আপ্‌নি ডেকে আন্‌লি?

অত্যাচারী শাসকের দণ্ড ধরিয়া সিধু চক্রবর্ত্তী কিশোরীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই, দাঁড়াইয়াছিল—তার স্বভাবের ক্রূরতা লইয়া। পাষাণের বক্ষেও আঁচড় লাগে, হিংস্র ব্যাধের মর্ম্মেও কারুণ্যের প্রস্রবণ বহে! আজ রামীর হৃদয়ভেদী হাহাকারের ছন্দহারা গান, নিয়তির ইঙ্গিতে সিধুর মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিল। আহা! সত্যই তো!—কিশোরীর মত হতভাগিনী এ জগতে কে আছে? লক্ষ বিশ্ববাসীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া যে কণামাত্র করুণার প্রত্যাশায় অঞ্জলী বাড়াইয়া আছে, মানুষ হইয়া সে দীন আত্মার প্রতি কোন পরাণে নির্ম্মমতা পুরস্কার দিতে বসিয়াছিল! যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অন্তর-ব্যথা উজাড় করিয়া চরণতলে ঢালিতে

আসিয়াছিল, সহানুভূতির বদলে তিরস্কার দানে, সমাজনেতা হইয়া সমাজের উপকারার্থে কী সে করিয়াছে!

গুপ্ত-অভিসন্ধির কথা সিধু চাপিয়া রাখিল না। বলিল—নন্দলাল! বাবা! কপালের লেখায় মানুষ কষ্ট পায়, কিন্তু উপলক্ষ্য হ'তে হয় মানুষকেই। কিশোরীর কথায় আমার ভয়ানক রাগ হ'য়েছিল; তাকে জব্দ করবার জন্যেই—

—"টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলেচ?...ঠাকুর! ঠাকুর! তোমরা কি সত্যিসত্যিই বামুন? দয়ামায়া হীন—তবু তুমি দশখানা গাঁয়ের পুজো পাও?" বলিতে বলিতে রামী সিধু ঠাকুরের পায় তলায় মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সিধু অপ্রতিভের একশেষ হইয়া গেছে তখন। কহিল—অতবড় অপবাদ দিস্‌নি মা!—যতই করি, খুন করবার প্রবৃত্তি আমার কখনো হবে না। তা কি পারি মা? মানুষ হ'য়ে মানুষের জীবন নেওয়া, একি হয় কখনো?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া রামমনি বলিতে লাগিল—তোমার পায়ে পাড় বাবা-ঠাকুর! কোথায় রেখেচ তাকে বলো।...সে যে বড় অসহায়, বড় অনাথা! মানের ভয়ে সে যে পাকা তালের আঁটি চুষে খেত!.. কেন তাকে তাড়ালে? এই এত বড় গাঁ খানায়, এতটুকু ঠাঁই নিয়ে সে কপালের সঙ্গে লড়াই করছিল, কেন তার অমন সর্ব্বনাশ করলে?

নন্দলাল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কহিল—পেঁচিয়ে কথা ব'লো না ঠাকুর! পষ্ট বলো—কিশোরী দিদি কোথা? আমি এক ব্যাটাকেও আস্ত রাখ্‌বো না আজ! দেখি কার বুকে কতখানি সাহস আছে। না

ভর জীবনটা দ্বীপান্তরেই কাটিয়ে দেব। জান্ত গয়লা নন্দলাল প্রাণের মমতা রাখে না। বলো শীগ্‌গীর।

সিধু ভয়ে ভয়ে কহিল—রাগের মাথায় অন্যায় হ'য়ে গেছে নন্দলাল! তার জন্তে মাপ চাচ্ছি। এক্ষুনি সহরে যাও, নিশ্চয়ই কিশোরীকে তার বাপের বাসায় দেখ্‌তে পাবে।...পশুপতির খুব ব্যারাম,—এই মিথ্যে খবর দিয়ে আমি তাকে সহরে পাঠিয়েছি। যে লোকটা খবর দিতে এসেছিল, সে আমাদেরই লোক, কিন্তু গাজলপুরের নয়। কিশোরী তাকে চেনে না, তবু বাপের কলেরা হ'য়েচে শুনে, কাঁদ্‌তে কাঁদতে অচেনা লোকের সঙ্গেই চ'লে গেছে।

নন্দলালকে আট্‌কাইয়া রাখে—এখন সাধ্য রামমনির নাই, বেচারী মহাবিপদে পড়িল। নন্দলাল তখন হাতের লাঠিখানা উঁচু করিয়া তুলিয়াছে, আর রামী দুই হাতে লাঠি ধরিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিতেছে—পায়ে পড়ি ছোড় দা! ক্ষান্ত হও। বামুন যে!......আমাদের সর্ব্বস্ব উড়ে পুড়ে যাবে—দোহাই তোমার থামো।

হঠাৎ নন্দলাল লাঠিখানা দশহাত দূরে ছুঁড়িয়া দিয়া, উপুর হইয়া সিধুঠাকুরের পায়ের তলায় শুইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাবাঠাকুর! দেব্‌তা হ'য়ে একাজ কেন করলে? তোমার বুকের ভেতর মায়া দয়া কি একটুও নেই? মেয়েটার মুখের পানে একটা দিনও কি চোখ চেয়ে দেখনি?

সিধুর দুটি চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারা গড়াইতেছিল! আজ সত্যি সত্যই পাষাণের বুকে প্রস্রবণ ছুটিয়াছে। সিধু কহিল—সে আমায় মিনতি ক'রে যা ব'লেছিল, আমি তা তিরস্কার ভেবে উল্টো বুঝেছিলাম

নয়! আমি বুঝিনি যে, বেচারী অধিকারের দাবীতে আমার কাছে অনুগ্রহ চেয়েছিল। তার কথা বল্‌বার ভঙ্গীটা আমি ভালোভাবে নিতে পারিনি।...কিন্তু হাতের ঢিল্ হাত থেকে চ'লে গেছে, আর তো ধরবার উপায় নেই বাবা! এখন যত শীগ্‌গীর পারো পশুপতির বাসাটা ঘুরে এসো গে।

রামী জিজ্ঞাসা করিল—এ খবর আর কেউ জানে? না আপনিই নিজের মনে ক'রেছিলেন?

সিধু কহিল—একা আমি নয়, গাঁয়ের অনেকেই জানে। কিন্তু আজ যজ্ঞোপবীত ছুঁয়ে দিব্যি করলাম মা! আর কোনদিন তাকে অনাদর কর্‌বো না। সে আমাদেরই একজন হ'য়ে থাক্‌বে।

ম্লান হাসি হাসিয়া রামী কহিল—যদি বেঁচে থাকে, তবেই তো! নইলে আপনাদের কীর্ত্তিটাই চিরকাল আমরা মনে রাখ্‌বো। আর সে আবাগী মরণের পরেও ভুলবেনা যে, মানুষ হ'য়ে মানুষকে তোমরা কতখানি ছোট দেখেছিলে!...তা হ'লে মিছিমিছি দেরী ক'রো না ছোড়্ দা! হতভাগী আছে কি ম'রেছে—একবারটি খোঁজ নিয়ে এসো।

বলিষ্ঠ সুদীর্ঘ দেহটা যেন আর তুলিতে পারে না, নন্দলালের এম্‌নি অবস্থা! দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, উঠিতে উঠিতে কহিল—জীবন পণ,—তবু আমি সহজে ছাড়বো না। দেখি—গাজলপুরের মাতব্বর বাবুরা কি রকম শয়তানি জানে।...দিদিকে আমার পাই আর না পাই, থানাটা ঘুরে আস্‌তে ভুলে যাবো না—এ তোমরা ঠিক জেনে রেখো ঠাকুর! লোকের ভাল তো দেখ্‌তেই পারো না, মন্দ দেখাও কি তোমাদের স্বভাবের বাইরে?...কিশোরী দিদির চেয়ে মন্দ কপাল তো দুনিয়ায় আর কারুর

নেই বাবাঠাকুর! তবে কি জন্তে তার ভাঙাকুঁড়ের বাস উঠিয়ে ছাড়লে? ·

উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বামী কহিল—আর কথা বাড়িয়ো না ছোড় দা! যদি বাপের বাসায় না গিয়ে থাকে, তা হ'লে কোথায় গেছে খোঁজ করতে হবে না?

নন্দলাল লাঠিখানা হাতে করিয়া মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল, তারপর হঠাৎ সিধুচক্রবর্ত্তীর পা তলায় মাথা নোয়াইয়া বলিল—আশীর্ব্বাদ ক'রো বাবাঠাকুর!

* * * * *

কিশোরীর বাটী হইতে নিজের বাটী আসিবার পথেই রামমনি সংবাদ পাইল—গ্রামের মধ্যে কথা চলিতেছে—কিশোরী একলা নিশিরাতে ঘরের বাহিরে পা দিয়াছে, সুতরাং সামাজিক বিধানে সর্ব্বাংশে সে পরিত্যজ্যা!...গ্রামবাসীর বাহাদুরী!...

* * * নন্দলাল যতখানি দ্রুত হাঁটিয়া সহরে পৌঁছিল, ততখানি দ্রুত চলা সাধারণ মানুষের শক্তিতে কুলাইয়া উঠে না। বেলা নয়টার কাছাকাছি, সে পশুপতির বাসায় আসিয়া সদর দরজার উপর মাথায় হাত দিয়া বসিল। কি সর্ব্বনাশ! বাড়ীর দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছে!...হায়! হায়! তবে সিধু ঠাকুরের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা! কথার জাল বুনিয়া আজ সে নন্দলালকে এমন করিয়া আবদ্ধ করিল!

নন্দলাল কাঁদিয়া ফেলিল।—দিদিরে! তবে সত্যিসত্যিই তোকে জগত থেকে সরিয়ে দিলে!...অপরাধ নাই, তবু তোকে হত্যাকারীর সাজা ভোগ করতে হ'ল!

অনেকক্ষণ নিঝুমের মত বসিয়া থাকিয়া, নন্দলাল যখন গা ঝাড়া দিয়া উঠিল—তখন মধ্যাহ্ন। প্রতিবেশীদের মুখে সংবাদ পাইল—কিশোরীর মতই একটি মেয়ে অধিক রাত্রে পশুপতির খোঁজ লইতে আসিয়াছিল, এবং পশুপতি সৌরভীর বাড়ীতে গিয়াছে এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই, চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না।

নন্দলাল অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও সৌরভীর বাপের বাড়ীর খোঁজ পাইল না। সহরের বুকে নিয়তই কত ব্যাপার ঘটিয়া যায়, কে কত তার হিসাব নিকাশ রাখে?

নন্দলাল পাগলা কুকুরের মতই টলিতে টলিতে অস্থির চরণে গ্রামের পথ ধরিল। একবার সে দেখিবে—সিধুঠাকুর কলিকালের কত বড় জাগ্রত দেবতা।

———

নবম পরিচ্ছেদ

......"আমারই প্রাণ—তোমারই দান

তুমি ধন্য ধন্য হে !"......

কৃষ্ণপক্ষের একাদশী নিশি! জমাটবাঁধা অন্ধকার পৃথিবীর বুকখানাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে!

প্রশস্ত জনমানবহীন প্রান্তরের মাঝে, জঙ্গলঘেরা এক পুষ্করিণীর কিনারায় দাঁড়াইয়া সাথের লোকটা বলিল—আমি আর যেতে পারবো না ঠাকরুণ! তুমি পারো—যাও। বাপের কালে ঢোলপুকুর গাঁ চোখে দেখিনি। এই ঘুটঘুটে আঁধারে আমি পারবো না যেতে।

কিশোরী থমকিয়া দাঁড়াইল। বাপের সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ বহিয়া যে তাহাকে পিতৃসকাশে লইয়া যাইতে আসিয়াছে,—সে-ই বলে—"ঘুটঘুটে আঁধারে আমি যেতে পারবো না!" কহিল—যেতে পারবে না তবে এসেছিলে কেন? তেপান্তর মাঠে, রাতের বেলায় আমি একা কেমন করে যাবো?

লোকটি কহিল—আমার সঙ্গে তো ঢোলপুকুর যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়নি বাছা! আমি সহরে যেতে হুকুম পেয়েছিলাম।

কিশোরী যেন আকাশ হইতে পড়িল! অতিরিক্ত বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—কে তোমায় হুকুম দিয়েছিল? আমার বাবা নয়?

লোকটি বলিল—অতশত জানিনে বাপু! সিধুঠাকুর আমায় যেমন যেমন শিখিয়েচে, আমি তেমনি তেমনি ব'লেছি। তোমার বাবার বাসাটা জান্‌তাম, তাই সেখানে যেতে কষ্ট হয়নি। কিন্তু ঢোলপুকুর তো চিনিনি।...আচ্ছা ঢোলপুকুরেই যে তোমার বাবা বেয়ারাম নিয়ে প'ড়ে আছে, এ খবর কোথায় পেলে?...

কিশোরী সৌরভীর পিত্রালয় যে ঢোলপুকুরে, ইহা অনেক দিন হইতেই জানিত। বলিল—পাড়ার লোকেই তো ব'ল্‌লে। ঢোলপুকুর তারা না জান্‌লেও আমি জানি। বেশী দূরের পথ নয়। একটুখানি কষ্ট করে আমায় পৌঁছে দাও, ডবল মজুরি পাবে।

—দুঃ তোর মজুরি! মজুরির মুখে দু'শো পয়জার মারি। বাঁচ্‌লে তবে তো মজুরি ভোগ করবো?...এই তেপান্তর মাঠে, বনের ধারে, যদি বাঘ ভাল্লুক তাড়া করে—

কিশোরীর বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। ভয়ে ভয়ে বলিল—কিন্তু আমার যে বড্ড বিপদ! বাবার অসুখ, তিনি কেমন আছেন খবর না পেলে আমি তো নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো না বাপু!...

উপহাস ও ঘৃণার সঙ্গে লোকটি বলিল—দেখ ঠাক্‌রুণ! তোমার অমন বাপ, থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। অন্ধের আবার রাতদিন কি আছে?—যে বাপ মেয়ের মুখ দেখে না, সে বাপের খোঁজ নিতে মেয়ে হ'য়েও তোমার সাধ হয়?......পশুপতি চাটুয্যেকে আমি খুব জানি,—ব্যাটা ছোট লোক—

কিশোরী ব্যথিত হইয়া বলিল—তোমাকে যেতে হবে না বাছা!

আমি একা একাই পথ চিন্‌তে পারবো। তুমি যেখানে খুসী চলে যাও। আমিও আমার পথ দেখি।

লোকটি কহিল—বেশ তো যাও না! আমিও তো তাই চাচ্ছি।

কিশোরী বলিল—যদি কথায় কথায় আমার বাবাকে গালাগাল দাও, তা হ'লে সত্যি সত্যিই তোমার গিয়ে কাজ নেই। যতই করুক, তবু তিনি আমার বাবা।

"—আহা মরিরে!—অমন বাবার মুখে আগুণ"—বলিতে বলিতে লোকটি যখন বিপরীত পথ ধরিল, তখন কিশোরীর প্রাণে বিন্দু-মাত্রও আর ভরসা রহিল না। তথাপি তাহার বিশ্বাস হইতে ছিল না যে, এই নির্জ্জন জঙ্গলের মাঝে, নিশীথরাত্রে, যত নির্দ্দয়ই হোক—তবু মানুষ তো সে—কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইবে না।

কিন্তু সাথের লোক সত্যসত্যই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল।

কিশোরী তখন একা! পথের মাঝে একা, সংসারের মাঝেও একা!—হঠাৎ মনে হইল, ঢোলপুকুর যাইবার পথ সে কখনো জানে না, যাহাকে সঙ্গে লইয়া এতখানি অগ্রসর হইয়াছে সে-ও তো বলিয়া গেছে—জানে না, তবে কোন্ ভরসায় সে এই একান্ত অজানা পথে পা বাড়াইয়া রহিল?...আজ এই নির্জ্জনতার মাঝে যদি একটা হিংস্র জন্তুরও সাক্ষাৎ মেলে, তবুও যেন কিশোরীর প্রাণে বল আসে।...মানুষ যখন সকল রকমে অসহায় হইয়া পড়ে, তখন অসহায় অবস্থাকেই সহিয়া লইতে সে বাধ্য হয়। কিশোরী ভীতিসঙ্কুল স্থানেই নির্ভয়তা আনিয়া পথ চলিতে-ছিল। পায়ে কাঁটা ফোটে, চামড়া কাটিয়া রক্ত ছুটিতে থাকে, তবু তাহাকে চলিতেই হইল। এ যেন অসীমদেশের যাত্রী,—অসীম তার পায়ে

চলার পথ, সে পথের আর শেষ সীমা নাই।......সাথের সাথী ঘোর অন্ধকার!

একটা গাছের গুঁড়িতে কপাল ঠুকিয়া কিশোরী—'মাগো' বলিয়াই আছাড় খাইয়া পড়িল। সংজ্ঞা হারাইলে ভালই হইত, দাবদগ্ধ সংসারের জ্বালা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য ভুলিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না।... ইহাও বুঝি ভাগ্যেরই বিড়ম্বনা।—কপাল কাটিয়া দরদর ধারে রক্ত ঝরিতেছে, যাতনায় প্রাণ যায়!—কিশোরী হাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া সেখানেই শুইয়া রহিল।...মন আর্তচীৎকারে বলিতে চাহে—বাবা! বাবা! এখনো কি তুমি জান্‌তে পারনি বাবা!—আমি তোমাকে কত ভালবাসি?

একখানা গরুর গাড়ী যাইতেছিল—ঠিক পাশের বড় রাস্তা দিয়া। অন্ধকারে কিশোরী এ পথের সন্ধান জানিতে পারে নাই। একটু আগে যে হিংস্র জন্তুরও সাক্ষাৎ মাগিতেছিল, এখন গাড়ীর সাড়া কানে আসিতেই, যাতনা-কাতর কণ্ঠে ডাকিল—ওগো! কে যাও,—আমাকে রক্ষা করো!

কিন্তু কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। কিশোরী আবার ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দিল—ওগো! গাড়ীতে কে আছো,—আমি ম'লাম্ আমাকে বাঁচাও!

গাড়ী থামাইয়া গাড়োয়ান্ লণ্ঠন লইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে কিশোরীর নিকট আসিল, কিশোরী দুইহাত দিয়া তাহার দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা?......আমি মরছি, প্রাণ যায়!...আমাকে বাঁচাও।...ঢোলপুকুরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে এসো। তোমার তো গাড়ী আছে, আমি ভাড়া দেব।

গাড়োয়ান কহিল—আমি তো আর ঢোলপুকুর যাবো না বাপু!—সেখান থেকে আস্‌চি, যাবো রামপুর। গাড়ীতে আমার লোক র'য়েচে। সেথানে সোয়ারী পৌঁছে দিয়ে, ফির্‌তে আমার সকাল বেলা হ'য়ে যাবে। বলিতে বলিতে অকস্মাৎ কিশোরীর কপালে রক্ত দেখিয়া, গাড়োয়ান্ শিহরিয়া উঠিল। ব্যথিত হইয়া কহিল—আহারে! কেমন ক'রে লাগলো মা! বড্ড কেটে গেছে তো!

ওদিকে গাড়ীর আরোহী উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল—কি হ'ল রে?—যাবি না কি?...কে ও?...

গাড়োয়ান্ ব্যস্ত হইয়া বলিল—বাবু তাড়া দিচ্ছে মা! লোকটা বড় সুবিধের নয়, নইলে এক্ষুণি তোমায় গাড়ীর মধ্যে তুলে নিতাম।

কিশোরী নীরবে কপাল টিপিয়া বসিয়া রহিল। আজ আর দুষ্ট লোকের কবলে পড়িতে তার ইচ্ছা নাই। মৃত্যু বরং ভাল, হিংস্র জন্তুর কবলিত হওয়াও লক্ষগুণে বাঞ্ছনীয়, তবু মানুষের চক্রান্তে পড়িবার সাধ মনের কোণেও আসা উচিত নয়।...চক্রান্তের আবর্ত্তে পড়িয়াই আজ সে বিভীষিকার মাঝে গুমরিয়া মরিতেছে!

গাড়োয়ান চিন্তা করিতেছিল। আরোহীর বিরক্তিকে সে গ্রাহ্য না করিয়া কহিল—উঠে এসো বাছা!—আমি তোমায় নিয়ে যাবো, কিন্তু ঢোলপুকুরে কার বাড়ী যাবে?

কিশোরী উঠিবার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিল না। মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। গাড়োয়ান কহিল—আহা রক্তে মুখখানা যে ভেসে গেল মা!—আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলো। বলিয়াই কিশোরীর দুহাত ধরিয়া উঠাইল। তারপর আর কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া, অতি

সন্তর্পনে তাহাকে গাড়ীর কাছে লইয়া গিয়া, হাতের লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিল।

গাড়ীর আরোহী তীব্রস্বরে বলিলেন—ও আবার কে?

কিশোরী ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল—কে—কে কথা কইলে? আমার বাবা?...বাবা!

আরোহী—পশুপতি চাটুয্যে। কন্যার আর্ত্তস্বর শুনিয়া বিরক্তির সুরে বলিয়া উঠিলেন—ভাল আপদ!...তুই আবার কোত্থেকে এসে পড়লি?

কিশোরী দৈহিক যাতনা ভুলিয়া গেল। কপালের রক্ত চোখ দুটিকে ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছে, তবুও সে ব্যাকুল হইয়া বলিল—বাবা! বাবা! তুমি কেমন আছো বাবা?...আমি যে তোমার অসুখ শুনে ছুটে এসেচি বাবা!

পশুপতি আস্তে আস্তে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। কিশোরী তাঁহার পদতলে বসিয়া এক হাতে কপালের রক্ত মুছিতে লাগিল, অপর হাত পিতার পায়ের উপর রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল—পথ ভুলে বড্ড কষ্ট পেয়েছি বাবা! দেখনা কপালটা ফেটে রক্ত ছুটচে। সঙ্গের লোক ফেলে পালিয়েচে। কিন্তু তুমি ভাল আছ তো বাবা? অসুখ সেরে গেছে তো?

গাড়ীর ভিতরে অর্দ্ধশয়নাবস্থায় থাকিয়া সৌরভী অবজ্ঞার সুরে বলিল—ও আমার বাছারে! মেয়ের ঢঙ্ দেখে আর বাঁচিনি গ...সেরে গেছে তো বাবা! ওঃ বাবার কথা ভেবে ভেবে মেয়ের আর দুঃখের শেষ সীমা নেই!...পাজী নচ্ছার মাগী!...গাড়োয়ান! গাড়ী ছাড়ো। রাত ভোরে শয়তানি ঢঙ্ ভাল লাগে না। তারপর পশুপতিকে লক্ষ্য করিয়া

বলিল—কিগো! মেয়ের ওপর বড্ড যে দরদ দেখ্‌তে পাচ্ছি।...বলি যাবে, না গাড়ী ঢোলপুকুরে ফিরে নিয়ে যাবো?

পশুপতি 'হাঁ-না' কোন কথাই না কহিয়া, গম্ভীরভাবে কিশোরীর পানে চাহিয়া ছিলেন।

স্তিমিত লণ্ঠনের আলোকে কিশোরী দেখিল—সে মুখে স্নেহ-মমতার বিন্দুমাত্র আভাষ নাই, আছে—বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট! কহিল—আমার ওপর রাগ করেছ বাবা?...সিধুঠাকুরের মুখে তোমার অসুখ শুনেই আমি চ'লে এসেচি। রামী বা নন্দ দাদা কারুকে ব'লে আস্‌বার সময় পাই নি।...সত্যি তোমার অসুখ হ'য়েছিল বাবা?

পশুপতি গম্ভীর হইয়াই কহিলেন—মরণ হয় নি কেন—তাই ভাবচি কিশোরী! চিরকালটাই কি তোরা আমায় জ্বালিয়ে মারচি?...ছি ছি! মেয়ে হ'য়ে বাপের উঁচু মাথাটা এমনি করেই কি নীচু করে দিতে হয়?

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে চাহিতে কিশোরী কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল—এ তুমি কি ব'ল্‌চো বাবা?...আমি এসে কি অন্যায় করলাম?... তুমিই তো আস্‌তে লিখেছিলে। যে লোক আমার সঙ্গে এসেছিল, সে ব'ললে—সিধুঠাকুর তাকে আস্‌তে ব'লেছে।...তুমি কি সিধুঠাকুরকে ব'লে পাঠাও নি?

পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—দেখ্ কিশোরী! কেলেঙ্কারী যা করেছিস্, তাতে হয় তুই মর, না হয় আমি মরে জ্বালা জুড়োই।...যদি কখনো গাজলপুরে আমায় যেতে হয়, তোর জন্যে সেখানে এতটুকু মুখ পাবো না। ছি ছি!...হাঁ রে আমার মেয়ে হ'য়ে তোর এতদূর অধঃপতন হ'ল কেমন করে?

কিশোরী গম্ভীর হইয়া গেল। সামান্যক্ষণ নীরব থাকার পর, কহিল—একথা তোমায় কে ব'ললে বাবা?...কি অধঃপতন হ'ল আমার?

পশুপতি কহিলেন—সে তুই নিজেই তো বুঝ্‌তে পারছিস।...সিধু-ঠাকুর সমস্ত কথা বিস্তারিত লিখে, আমার কাছে লোক পাঠিয়েছিল। মন বড্ড বেশী খারাপ হ'ল ব'লেই না ঢোলপুকুরে চ'লে এসেছিলাম। নইলে অসুখ অবস্থায় সৌরভীকে কি জোর করে নিয়ে আস্‌তাম? বেচারী বাতের ব্যথায় সারা হ'য়ে যাচ্ছে, তবু জলকাদার রাস্তা দিয়ে বর্ষার ঠাণ্ডায় ওকে গরুর গাড়ী করে নিয়ে যেতে হচ্ছে!...নইলে জ্বালা জুড়োই কেমন করে!...ছি ছি দড়ি কল্‌সী কিন্‌বার একটা ফুটো পয়সাও কি তোর ঘরে ছিল না রে?

কিশোরী মাথায় হাত দিয়া পথের মাঝেই বসিয়া রহিল। আজ আর কৈফিয়ৎ দিবার জন্য তাহার কণ্ঠে একটা ছোটখাটো ভাষাও ফুটিয়া উঠিল না। ঘৃণায়, অপমানে সর্ব্বাঙ্গ তার জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল।

সৌরভী কহিল—উঠে আয় মিন্‌সে! আর বাপ্‌গিরি ফলাতে হবে না। ঘর ছেড়ে যে পথে বেরিয়েচে—তাকে আবার ঘরে নেওয়া! লোকে ব'লবে কি?

কিশোরী মুখখানা তুলিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিয়া ফেলিল—আর যে বলে বলুক, অন্ততঃ তোমার মুখে একথা মানায় না। আমার বাবা আমায় দশবার লাথি ঝাঁটা মারতে পারেন, কিন্তু তুমি তার জবাব দিবার কে?...বাপ-মেয়ের কথার মাঝখানে তুমি কেন কথা কইতে আস্‌বে?...

সৌরভী বলিল—ওরে আমার মেয়ে—

ডানহাতখানা বাড়াইয়া শাসাইবার ভঙ্গিতে কিশোরী বলিয়া উঠিল —চুপ্ ! খবরদার !...এখন থেকে সাবধান করে দিচ্ছি।

সৌরভী ক্ষিপ্তার ন্যায় পশুপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল— হাঁ্যারে হাড় হাবাতে অলপ্পেয়ে চামাড় মিন্‌সে !—বলি শুন্‌চিস্ ?

কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—চোপ্ ! পাজী ছোটজাত কাঁহাকার !...আমার বাবাকে যা-তা বলিস্ ? বেইমানী......

আশ্চর্য্য ব্যাপার !—সৌরভী তার বাতের অসহ্য ব্যথা ভুলিয়া গেল! তাড়াতাড়ি গাড়ীর ভিতর হইতে নীচে নামিয়া, পশুপতির পিঠের উপর কিল মারিতে মারিতে বলিল—এক—দুই—তিন—চার......বেহদ্দ বেহায়া মুচি মুদ্দফরাস—অজাত মিন্‌সে !...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অপমান শুন্‌বি ?...তারপর দুইতিন ধাক্কা দিয়া বলিল—তবে পায়ে ধ'রে সেধে কেঁদে আন্‌লি কেন রে হাড়ি ডোম্ মেথর চণ্ডাল ? ওরে—ও নির্ব্বংশে !—কেন আমায় মাথায় করে ব'য়ে আনতে গেছলি ?

উত্তমের বাক্য জ্বালা মৃত্যু তুল্য হয়,
পদাঘাতে অধমের কিছু নাহি ভয়।

কিশোরী সৌরভীর মুখের তোড় সাম্‌লাইতে পারিল না। অতিরিক্ত লাঞ্ছনার ভয়ে, নীরব হইয়া পিতার আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

পশুপতি বলিলেন—ওরে ! আগে ভাগে গালমন্দ করা তোর উচিত হয় নি কিশোরী !

কিশোরী পিতার পাদস্পর্শ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল—রাত্রিকাল, আকাশের তারা, পৃথিবীর জল-বাতাস-লতা-গাছ-ফুল সব সাক্ষী,—তুমি জন্মদাতা আমার, এই চরণ ছুঁয়ে, আমার মাকে স্মরণ ক'রে শপথ করছি

—আমি কোন দোষে দোষী নই। সিধু ঠাকুর মিথ্যে রটিয়ে তোমাকে চিঠি লিখেছিল, নইলে ব'লতে পারো বাবা! দোষী হ'য়ে, তোমার অসুখ শুনে এই রাত্রি দুপুরে একা আমি ঐ ছোটলোক মাগীর বাড়ী যেতে পারি কখনো? তুমি আমার ইহকালের দেবতা, পাছে সেবায় বঞ্চিত হই, এই ভয়েই না ঢোলপুকুর যাবার সাধ ক'রেছিলাম। নইলে—সে তো আমার কাছে নরক। এই যে বিনা দোষে, মেয়ে হ'য়েও বাপের সুমুখে ও আমায় অপমানের একশেষ করলে—আর বাপ হ'য়ে, তুমি সমস্ত শুনেও, উল্টে আমাকেই দোষ দিচ্ছ—একি কম কষ্ট আমার? আমি সতী মায়ের মেয়ে, আমার মা অনাহারে মরেছে, তবু অদৃষ্ট ছাড়া ভুলেও একদিন তোমাকে দোষ দিয়ে যায় নি।...আমিও সেই মায়ের মেয়ে!... আমি সব সইতে পারি, কিন্তু ছোটলোক ঐ মেয়েটা যে আমারই সুমুখে তোমাকে অকথা কুকথা ব'লবে, এ আমি কখনো বরদাস্ত করবো না। যদি তোমার অভিশাপে পড়ি তবুও না। আজ তুমি বিচার করো বাবা! ওর নয়, আমার দোষের বিচার ক'রো।...

পূর্ব্ব আকাশে ভোরের তারা জ্বলিতেছিল। জঙ্গলের পাখী প্রভাতীর সুর ভাঁজিতেছিল। ধানের ক্ষেতে ভোরের বাতাস পরশ বুলাইতে সুরু করিয়াছিল।

পশুপতি আনমনা হইয়া গেছেন। অতীতের সুর হারা বীণাটা আজ যেন মর্ম্মবেদনায় গুমরিয়া উঠিতেছে—স্ত্রী অনাহারে মরেছে তবু অদৃষ্ট ছাড়া ভুলেও একদিন স্বামীর দোষ দেয়নি!...হায় রে! ভাগ্যের চাকাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজ কোন্ স্থানে আসিয়া পড়িল!

সৌরভী উষ্ণ হইয়া গাড়োয়ান্‌কে ভর্ৎসনা করিল—তুই ভাড়া নিবি,

না এম্‌নি এম্‌নি যাচ্ছিসরে? হাঁ করে চেয়ে রয়েছিস্ যে! যেতে হবে না?

গাড়োয়ান বলিয়া উঠিল—যেখানেই যাই, এ মেয়েটিকে আমি গাড়ীতে তুল্‌বো।...যদি আপত্তি থাকে, তোমরা গাড়ী ছেড়ে দাও, এক পয়সাও আমি ভাড়া চাইনে।

সৌরভী তো অবাক্!...ব্যাটা ছোটলোক বলে কি? কিন্তু রাগটা সম্পূর্ণভাবে পড়িয়া গেল—কিশোরী ও পশুপতির উপরে। কিশোরীকে বলি'—দেখ্ এই চামাড় মিন্‌সেই যদি তোর বাপ হয়, তাহ'লে আমার ভাড়া করা গাড়ীতে পা দিস্‌নি।...তারপর পশুপতিকে বলিল—উঠে আয় ছোটলোক মিন্‌সে!...সুমুখে দাঁড়িয়ে যা নয় তাই ব'লে গাল দিলে,—এম্‌নি তুই অমানুষ, যে, একটা শাসনবাক্যিও ব'ল্‌তে পারলিনি? ওঃ... মেয়ে!...ওঁর সাতপুরুষের মেয়ে! ওর চেয়ে বাজারের বেবুশ্যেরও কদর আছে।

—"মুখ সাম্‌লে কথা ক'য়ো বাছা! ঢের স'য়েচি, আর সইবো না কিন্তু।" বলিয়াই কিশোরী বাপের পানে চাহিল। দেখিল—পশুপতি সৌরভীর দিকে চাহিয়া আছেন। তাহার এই অতিবড় অপমানেও তাঁর তরফ হইতে কিছুমাত্র সাড়া মিলিবার সম্ভাবনা নাই।

সৌরভী এইবার চরম করিবার জন্য কিশোরীর চুলের মুঠি ধরিয়া টান দিল। কিশোরী উত্তেজনার আধিক্যে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—তোমার কি মায়া দয়া নেই বাবা? স্নেহ-মমতা না করো, কিন্তু মেয়ে ব'লে চরণেও কি ঠাঁই দিতে পারোনা? জ্ঞানে কখনো অপরাধ করিনি, যদিই করে থাকি, কিন্তু তারও কি মার্জ্জনা নেই?

—"চুপ্ কর হাড়হাবাতি ছোটলোকের মেয়ে!" বলিয়া সৌরভী গাড়োয়ানকে কহিল—গাড়ী ফিরিয়ে নে, আমি ঢোলপুকুরেই ফিরে যাবো।

পশুপতি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—সেই ভাল। আজ আর তোমার গিয়ে কাজ নেই। কিন্তু মেয়েটা তো হাঁট্‌তে পারবে না। বড্ড জখম হ'য়ে গেছে। গাড়ীখানা আমাদের চাই।

ঝঙ্কার দিয়া সৌরভী বলিল—তোর বাবার গাড়ী—বটে?

হঠাৎ গাড়োয়ান্ বলিয়া উঠিল—তোমারও তো বাবার গাড়ী নয় বাছা! মেয়েটাকে আমি 'মা' ব'লেছি, মাকে আমি আসল জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো।

—আর আমি?

—তোমার যা খুসী ক'রো।

—ভাড়া কে দেবে?

—ভাড়া? আমি পোড়াই কেয়ার করি। চাইনে ভাড়া।

সৌরভী চাহিয়া দেখিল—পূব্ আকাশ ফাগের রঙে রাঙা! ঊষার আলোকে চারিদিক ছাইয়া গেছে। পশুপতি কহিল—দেখ বামুনঠাকুর! একটুখানি পথ আমি পায়ে হেঁটেই যেতে পারবো। ঐ তো ঢোল-পুকুর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ব'লে রাখচি—তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমার জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল। কেঁদে মাথা খুঁড়ে মরলেও সৌরভী আর সহর মুখো পা বাড়াবে না।

কন্যার যাতনামলিন রক্তাক্ত মুখখানার পানে চাহিয়া পশুপতি বলিয়া উঠিলেন—আজ একযুগ পরে আমিও তাই চাচ্ছি সৌরভী। যদি না-ই

যাও, পশুপতি চাটুয্যে মাথা খুঁড়ে কাঁদতে বসবে না—এইটুকুই জেনে রেখো। শনির দৃষ্টি চিরকাল থাকে না। বামুনের ছেলে হ'য়ে মেয়ের সাম্‌নে অনেক গাল মন্দ তোমার সহ্য ক'রেছি। আর হয়তো পারবো না।

সৌরভী হয়তো এতখানির আশা করে নাই। নরম হইয়া বলিল—বেশ ভাল কথাই। আমিও কিন্তু সহজে ছাড়বো না। আইন আদালত ক'রে হোক্, জোর জবরদস্তিতে হোক্, যেমন করে পারি—খোরপোষ আদায় হবেই হবে।...জাত ধম্ম খুইয়েচি—তোমারই জন্যে, সহজে ছাড়বার মেয়ে নই আমি।

পশুপতি মৃদুস্বরে কহিলেন—জাতধর্ম্ম আগেই খুইয়ে ব'সেছিলে, আমার কপাল মন্দ তাই অলেয়ার পেছনে ধাওয়া ক'রেছিলাম। এখন তুমিও বাঁচো আমিও বাঁচি।...মেয়ের সাম্‌নে বেশী কথা আর ব'ল্‌বো না। এখন কি করবে বলো? সত্যিই ঢোলপুকুরে ফিরে যাবে তো?

সৌরভী আস্তে আস্তে গাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—ফিরে যাবার জন্যেই বুঝি কেঁদে কেটে আমায় বাড়ী থেকে নিয়ে এলে?...আমি যাবো না।

পশুপতি স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, কিশোরীকে বলিলেন—আয় মা! গাড়ীতে উঠ্‌বি আয়!

কিশোরী কহিল—আমি হেঁটে হেঁটে যাবো বাবা! একগাড়ীতে ওর আমার ঠাঁই না হওয়াই উচিত।

পশুপতি লজ্জিত হইলেন।...এ লজ্জা এতদিন যে কোথায় লুকাইয়াছিল, আজ সেই কথাটাই ভাবিয়া পাইলেন না। মিনতিভরা দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন—আয় মা! আয়!...ওরে যতই ক'রে থাকি, তবু আমি তোর বাপ।...আয়! উঠে আয়!

দশম পরিচ্ছেদ

"সুধা ভ্রমে আজি গরল ভ'খেচি,

সব হ'য়ে গেছে কালো।"...

সহরের বাসায় পৌঁছিয়াই কিশোরী বলিল—আমাকে গাজনপুরে রেখে এসো বাবা! এ বাড়ীতে আমি থাক্‌বো না।

পশুপতি কহিলেন—এ তো তোরই বাড়ী মা! থাক্‌বিনে কেন?... ঘর সংসার দেখে শুনে বুঝে নে। বিয়ে হ'য়ে গেলেও তোকে আর কাছ ছাড়া করবো না মা!...তেমনি ব্যবস্থা করেই আমি সম্বন্ধ দেখচি। বলিয়াই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিশোরী দেখিল—সৌরভী একে একে সকল ঘরগুলি তালাবন্ধ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—ঘরে চাবি দিচ্ছ কেন? আমাকে থাক্‌তে হবে না?

সৌরভী রান্নাঘর বাদে সমস্ত ঘরগুলি বন্ধ করিয়া উত্তর দিল—থাক্‌তে তো বারণ করিনি। যেথানে খুসী থাকো। তারপর জোরে জোরে হাঁকিল—কোথায় গো! বাজারে যেতে হবে না?

কিশোরী কহিল—বাবা বেরিয়ে গেলেন।

ক্রূর হাসি হাসিয়া সৌরভী কহিল—তা জানি।

—তবে আবার ডাক্‌চো কাকে?

—"তোমার যমকে।" বলিয়া সৌরভী চাবি ছড়া, আঁচলে বাঁধিল, তারপর কহিল—ঘরদোর সব রইলো। জিম্বা দিয়ে যাচ্ছি।

কিশোরী কথা কহিল না। অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া রান্নাঘরের সুমুখে বসিয়া পড়িল।...সৌরভী তখন চলিয়া গেছে।

পশুপতি ফিরিয়া আসিলেন—বেলা দশটায়। দেখিলেন—রান্নাঘরের মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া কিশোরী পড়িয়া আছে, চোখের কোণ বহিয়া তার অশ্রু গড়াইতেছে! জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে প'ড়ে আছিস কেন মা?...ঘরে শুতে হয়।

কিশোরী কথা কহিল না। পশুপতি বলিলেন—আয়! তোর জন্যে ভাল ঘরখানা ঠিক করে দিচ্ছি। বলিয়া কিয়দ্দূর যাইতেই বিস্মিত-ভাবে ফিরিয়া বলিলেন—ঘরে চাবি দিলে কেন?...সে কোথায়?

কিশোরী মাথানত করিয়া জবাব দিল—সে-ই চাবি লাগিয়ে স'রে পড়লো। কোথায় গেল তা বলেনি।

পশুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—এম্‌নি বলা কওয়া নেই, ঘরে ঘরে চাবি এঁটে স'রে পড়লো?...ঝগ্‌ড়া করেছিলি বুঝি? গালাগাল্‌ দিয়েছিলি?

রুদ্ধ অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কিশোরী জবাব দিল—আমি তো অনেকক্ষণ আগে ব'লেছি বাবা! যে, আমি সতী মায়ের মেয়ে। মায়ের পুণ্যে অন্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আমি শুধু তোমারই হুকুমে এখনো দাঁড়িয়ে আছি, নইলে জানো তো বাবা! কতদিন আমাদের মা-ঝির জল গিলে পেট ভ'রেচে, তবু তোমার দোরে হাত পাততে আসিনি।

পশুপতি আনমনা হইয়া পড়িলেন। আজ তিনি আপন মনশ্চক্ষুর

সাহায্যে স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন—হৃদয় নিকুঞ্জ শুষ্ক ভীষণ শ্মশানসম হইয়া গেছে!—অন্তর্দেবতা কপালে করাঘাত করিয়া, ভগ্ন মর্ম্মবেদী-মূলে রোদন করিতেছেন!—অশ্রুর প্রবাহে লক্ষ দরিয়ায় জোয়ার আসিয়াছে!

কিশোরী বলিল—চলো বাবা! এবার থেকে আমরা গাজলপুরেই থাক্‌বো। রাত ভোরে উঠে আমি তোমার কাছারীর ভাত রেঁধে দেব। তোমার একটুও অসুবিধে হবেনা বাবা!...চলো আজই চ'লে যাই।

পশুপতি পূর্ব্বের অন্যমনস্কতা লইয়াই জবাব দিলেন—তা-তো যাবিরে, কিন্তু সে মাগী গেল কোথায়?...রাগের মাথায়—

কিশোরী বলিল—রাগতো তার হয়নি বাবা!...

পশুপতি বলিলেন—কি জানি, বড্ড বদ্‌রাগী মানুষ। একদিন দুদিন নয় কিশোরী, আজ দশবছর তাকে দেখে আসচি।—বড্ড একগুঁয়ে স্বভাব।

বাপের অন্তরের অভিপ্রায় কিশোরীর বুঝিতে বিলম্ব হইলনা। সৌরভীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে তিনি যে একান্তই অক্ষম, ইহা আজ সে স্পষ্ট ভাবে জানিতে পরিল। বলিল—সে ফিরে এলে, আমি তাকে বুঝিয়ে ব'লবো বাবা!...যাতে আর একগুঁয়েমী না করে—

পশুপতি কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু তোকে 'পর' ক'রে এই যে ঘর দোরে চাবি দিয়ে গেল,—এর সাজাও সে আমারই হাতে ভোগ করবে কিশোরী। তাকে বুঝিয়ে দেব—আমার অবর্ত্তমানে—যা কিছু সব আমার মেয়ের।...শয়তানি সে, তাই ভালর নাগাল্ ধরতে শিখ্‌লে না।

এম্‌নি সময় সদর দোরে শব্দ হইল। পশুপতি অগ্রসর হইয়া কহিলেন

—এসেচে। দাঁড়া, না ব'লে যেখানে সেখানে বেরিয়ে যাওয়াটা তাকে বুঝিয়ে দিই—

কিশোরী তাড়াতাড়ি বাধা দিতে যাইবে, কিন্তু পশুপতি তখন দরজা খুলিয়াই চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—বেরো শয়তানি!—দূর হ'য়ে যা আমার বাড়ী থেকে। বলিয়াই এমন জোরে ধাক্কা দিলেন যে, নারী হইয়া বেচারী সে প্রবল ধাক্কা সহ্য করিতে পারিল না। রাস্তার ড্রেনে পড়িয়া গিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদে কাঁদিয়া উঠিল—"মাগো!"

কিশোরী অসীম বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—সে সৌরভী নয়, তার সোদরাধিক স্নেহময়ী গয়লাবউ!

আলুথালু বেশে কাঁদিতে কাঁদিতে রামমনিকে কোলে তুলিয়া কিশোরী বাটীর ভিতর আনিল। ব্যগ্র মিনতি ভরা কণ্ঠে কহিল—একাজ কেন করলে বাবা?...আমি যে এদের দয়াতেই বেঁচে ছিলাম এতকাল।

পশুপতি তখন হতভম্ব! মুখ দিয়া বাক্ সরে না! মাথাটা লজ্জা ও অনুতাপে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহে!

রামী উঠিয়া বসিল। সলজ্জ হইয়া কহিল—আমাকে লাগেনি দিদিঠাকুরুণ!...কিন্তু আমি তো কোন দোষ করিনি ভাই!

পশুপতি অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিলেন—আর আমাকে লজ্জা দিয়োনা মা! আমি লোক চিন্‌তে পারিনি। আর একজনকে ভেবে—

—"কেলেকারীর এক শেষ ক'রেছ!"—বলিতে বলিতে সৌরভী আসিয়া দাঁড়াইল! ভর্ৎসনার সুরে বলিল—খুব কীর্ত্তি রাখলে যা হোক্!...আমার দেহ ভাল নয়, মেজাজ তাই সকল সময় ঠিক থাকে না। কখন কি ব'লে ফেলি, জান্‌তে পেরে প'ন্তে সারা হই।...ছি ছি—

শ্রাদ্ধবাড়ীর প্রাঙ্গন।

(সিধু চক্রবর্ত্তী ও কিশোরী)।

মেয়েটায় এম্‌নি খোয়ার করে !...কিশোরী ! জল দে তো মা ! রামু গা ধুয়ে ফেলুক। কাপড় ছাড়ুক।

মুখ তুলিয়াই কিশোরী অবাক্ হইয়া গেল !—সৌরভীর পশ্চাতে শান্ত মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে—নন্দলাল। সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না সৌরভী হুকুমজারী করিতেছে আর নন্দলাল শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে কিসের মোহিনী মায়ায় ! রামীকে হাত পা ধুইবার ঠাঁই দেখাইতে যাইবার সময় নন্দলাল বলিল—ব্যস্ত হ'য়োনা দিদিঠাক্‌রুণ, রামীর বেশী কিছু হয়নি। কিশোরী কথা কহিল না।......

...ঘণ্টাখানেক বিশ্রমের পর, নন্দলাল বলিল—আমি বাড়ী চ'ললাম দিদিঠাক্‌রুণ ! রামী এখন তোমার কাছেই রইলো। ওবেলা এসে নিয়ে যাবো।

কিশোরী কিছু না বলিতেই, সৌরভী বলিল—না না, তোমারও এ বেলা যাওয়া হবেনা। বামুনঠাকুরকে বাজারে পাঠিয়েচি, রান্নাবান্না হোক্; খেয়ে, জিরিয়ে, ভাই বোনে এক সঙ্গে যেয়ো। তার পর কিশোরীকে বলিল—যা মা ! আর দেরী করিস নি, কূয়োথেকে জল তুলে, নেয়ে নে। রামু তুমিও যাও। আমি উনুন ধরিয়ে রাখচি।

নন্দলাল বলিল—খুড়োঠাকুর এত গুলো লোকের তরিতরকারী ব'য়ে আন্‌বে, আর আমি বাড়ী ব'সে আরাম কর্‌বো?...নাঃ তোমরা সব যোগাড় পত্তর করো, আমিও বাজরে চ'ল্‌লাম। বলিয়াই আর সে অপেক্ষা করিল না।...

কিশোরী ও রামী স্নান করিতে গেলে, সৌরভী ঘর দোরের চাবি খুলিয়া দিল এবং রান্নাঘর সাফ্ করিয়া উনুনে আগুন দিল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পশুপতি নন্দলালের সঙ্গে তরকারী ও মাছ লইয়া বাটী ফিরিলেন। মহা ধূমধামের সহিত সকলের মধ্যাহ্ন আহার শেষ হইল যখন, তখন বেলা তিনটা বাজিয়া গেছে। পশুপতির সেদিন কাছারী যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

অপরাহ্নে নন্দলাল যখন রামীকে গাঙ্গলপুর যাইবার জন্য তাগিদ দিল, তখন সে কিশোরীর কপালের ক্ষতস্থানে জলপটী বাঁধিতেছিল। নন্দলাল পূর্ব্বে লক্ষ্য করে নাই, দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি করে কাটলো দিদি?...অনেকখানি কেটেছে যে!...ওঃ ফুলে উঠেচে!

রামী বলিল—কাল রাতের বেলায় অন্ধকারে প'ড়ে গেছলো।

নন্দলাল চিন্তিতভাবে বলিল—ঘা হবে হয়তো।...নাঃ রামীর আর গিয়ে কাজ নেই। কাল সকালে যোগান দিতে এসেই নিয়ে যাবো। কিন্তু সৈরভী গেল কোথা? তাকে তো দেখ্‌চিনে!...

রামী জিজ্ঞাসা করিল—খুড়োঠাকুর কোথায়?

—তিনি তো উকীল বাবুর বাসায় গেছে। যাবার সময় দশবার করে বলে গেল—রাতটুকু আর রামমণিকে নিয়ে যেয়ো না নন্দ! ও থাক্‌লে কিশোরীর মনটা তাজা থাক্‌বে। যতই হোক্ নতুন ঠাঁই তো! ...তা হ'লে তুই থাক্ রামী। ঘর দোর ফেলে দুজনকার তো থাকা চ'লবে না। আমি আসি তা হ'লে।...

* * * নন্দলাল চলিয়া যাওয়ার পর প্রায় একঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, তথাপি সৌরভীর দেখা নাই। কিশোরী বলিল—নন্‌দাকে এমন করে—সৌরভী বশ করে ফেল্‌লে!...আমি তো আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।

রামী হাসিয়া বলিল—আমিও তাই। আমরা গাড়ী থেকে নামচি, সুমুখেই সৌরভী ছিল দাঁড়িয়ে। ছোড়দা জিজ্ঞাসা করলে—খুড়োঠাকুর কোথা আছে, দিদিঠাকরুণ কোথা আছে শীগ্‌গীর বলো, নইলে পুলিশ ডাক্‌বো। মজার কথা এম্‌নি, সৌরভী অত্যন্ত নরম হ'য়ে ব'ললে—তোর মুখ দিয়ে কি ভালকথা বেরোয় না বাবা? মেয়েটা আমায় 'মা' ব'ল্‌তে অজ্ঞান! কাল থেকে কত যত্ন ক'রে তাকে কোলে নিয়ে র'য়েচি। তবু তোরা আমাকে গাল মন্দ না দিয়ে ছাড়বিনি? বাস্‌! আর কি ছোড়দার রাগ থাকে? গ'লে জল হ'য়ে গেল। সৌরভী তখন আমাকে ব'ললে—আয় মা! বাড়ীর ভেতর যাবি আয়! তোর দিদি-ঠাকরুণ মা হারিয়েচে বটে, কিন্তু মা-হারানোর দুঃখু আমি তার নিশ্চয়ই ভুলিয়ে দেব।...

কিশোরী আপন অন্তরের কথা এবং গতরাত্রির প্রকৃত ঘটনার কথা একটুও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিল না। যাহারা দিবানিশি তাহার সুখ সুবিধার জন্য আপন স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহাদের সরল মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার গরল ঢালিতে সে কুণ্ঠাবোধ করিতেছিল।

রামী বলিল—কাল সকালেই আমি বাড়ী যাবো, কিন্তু আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করো ভাই! এখানে তোমার মন টিকবে তো? সৌরভীর সঙ্গে যদি বনি-বনাও না হয়, তা হ'লে গাঙ্গুলপুরে ফিরে যাওয়াই তোমার অত্যন্ত উচিত।...খুব ভেবে চিন্তে সকল দিক ঠিক রাখ্‌তে হবে।

অকস্মাৎ সম্মুখে আসিয়া পশুপতি বলিলেন—সৌরভীর সঙ্গে যদি ওর বনি বনাও না হয়, তাহ'লে সৌরভীই তার নিজের গাঁয়ে ফিরে যাবে। কিশোরীর আপন বাড়ী, ওর অধিকার ঘোচায় কে?...

মাথা নীচু করিয়া রামী বলিল—সৌরভী কিন্তু অনেকক্ষণ থেকে বাড়ী নেই। কোথায় গেছে ব'লে যায় নি।

পশুপতি বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কখন গেছে?—খাওয়ার পর?

—হ্যাঁ, আপনি যাওয়ার পরেই।

—যাক্‌গে—যেখানে খুসী। কিন্তু এতখানি দেরী তো কখনো হয়না। যেখানেই যাক্—সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসে। যাক্‌গে মরুকগে!...হ্যাঁ, তারপর কাজের কথা বলি। ক'লকাতার খবরের কাগজে, দু'টাকা খরচ করে একটা বিজ্ঞাপন পাঠালাম। উকীল বাবুই যুক্তি ব'লে দিলেন।...

রামী জিজ্ঞাসা করিল—সে আবার কি? তাতে কি হবে?

পশুপতি হাসিয়া বলিলেন—তোমার দিদিঠাকৃরুণের বিয়ে হবে, বড়লোক জামাই হবে, পয়সাকড়িও লাগবে না।

রামী প্রকাশ্যে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর সতত্ই প্রার্থনা করিতেছিল—আহা জন্ম হতভাগীর জীবন সফল হোক্, দেবচরণে তার ঠাঁই মিলুক।...

অনেক রাত্রিতে, সকলের আহারাদি শেষ হওয়ার পর, সৌরভী বাটী ফিরিল। পশুপতি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে চাহিলেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা কহিলেন না।

কিশোরী বলিল—খাবে চলো। সব ঢাকা দিয়ে রেখেছি।

সৌরভী বিরক্তির সুরে বলিল—ক্ষিদে নেই, খাবো না।

পশুপতি গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল?

—যেখানে খুসী। অত কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না।

পশুপতি ঈষৎ রাগিলেন। কহিলেন—কিন্তু মনে রেখ—অতখানি স্বাধীন হওয়াটা আমি পছন্দ করি নে।......

অবজ্ঞাভরে সৌরভী বলিল—না করো, না করবে। আমার সঙ্গে যদি না বনে, জবাব দাও, এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছি।

—এই দশবছরের ভেতর একথা তো অনেক দিন শুন্‌লাম, কিন্তু চ'লে যেতে তো একদিনও দেখ্‌লাম না।

ঝঙ্কার দিয়া সৌরভী বলিয়া উঠিল—ওরে হাড়হাবাতে বাহাত্তুরে বুড়ো, এই কামারের মেয়ের পা পূজো করে তোর চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হ'য়ে গেল—তা মনে পড়ে না?...ছোটলোক কিনা!

গালে হাত দিয়া রামী, কিশোরীর পানে অবাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। যে কিশোরী গত রাত্রিতে সৌরভীর কণ্ঠে পিতৃ-অপমানসূচক কথা শুনিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, আজ রামীর সম্মুখে এত ব্যাপার ঘটিয়া গেল—তথাপি তার মুখ দিয়া একটা কথাও উচ্চারিত হইল না।

কিন্তু মানুষের চামড়া গায়ে দিয়া, লক্ষ পাপের পাপী হইয়াও, আজ পশুপতি, কন্যা ও রামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই তীব্র অপমান নির্ব্বিচারে পরিপাক করিতে পারিলেন না। সৌরভীর হাতখানা ধরিয়া, একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন—মুখে লাগাম দিয়ে কথা বলিস্!...তোর বড় বাড় বেড়েচে। পাজী মেয়েমানুষ কোথাকার...

সৌরভীর বলিবার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর সীমা ছাড়াইল। চীৎকার করিয়া বলিল—বটে রে নির্ব্বংশে বেহায়া ছুঁচো বামুন! মেয়ে এসেচে ব'লে আমায় এত বড় অপমান!...বলিতে বলিতে কিশোরীর সম্বন্ধে এমন

একটা কটূক্তি করিল যে, কিশোরী ও রামমণি উভয়েই অসঙ্কোচভাবে বলিয়া ফেলিল—মুখ সাম্‌লে বলো!

—"তোদের ডরিয়ে বাস করবো নাকি?...ওঃ সতীমায়ের সতী-কন্যে! যেমন মা তেমনি মেয়ে!"—বলিতে বলিতে রাগে ফুলিতে লাগিল।

পশুপতি কিন্তু এত ব্যাপারের পরেও অতিরিক্ত রাগ দেখাইলেন না। গম্ভীরভাবে কহিলেন—আজকের রাতটুকু কাটুলে, কাল ভোর বেলাতেই তুমি অন্য পন্থা দেখো সৌরভী। এখানে আর তোমার ঠাঁই হবে না। আমি ঢের স'য়েচি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

......"যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি

সেথা যেতে প্রাণ চায় মা !"......

দুই সখীতে শয্যাশ্রয় করিয়া, সুখদুঃখের কথা হইতেছিল। সুখের কথা কি ছিল তাহা তাহারাই জানে, কিন্তু দুঃখের মর্ম্মগাথাই ষোলআনা। কিশোরী কহিল—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, ঠিক জবাব দিস্ রামী! আমার এখন কর্ত্তব্য কি?

রামী বলিল—বাপের কাছে থেকে, তাঁর সেবা করা।

—সে সুযোগ কপালে ঘটে তবে তো?

—কেন? সৌরভী কাল সকালেই চ'ল্‌লো যে?

—পাগল!...বাবার মেজাজ তুই জানিস্‌নি!...আমি ঠিক জানি, ডাইনীর মায়া থেকে তিনি কিছুতেই মুক্তি পাবেন না।

চিন্তা করিয়া রামমণি বলিল—আমার কথা যদি শোনো দিদিঠাকরুণ, তাহ'লে বলি, নইলে মিছি মিছি মুখ নষ্ট করবো না।...তারপর দিদি-ঠাকরুণের তরফ হইতে উত্তরের ভরসা না করিয়াই কহিল—ছোড়দা আস্‌বামাত্রই কাল দু'বোনে 'শ্রীহরি' করা যাক্।...এখানে থাকা তোমার কোন রকমেই উচিত নয়। খুড়োঠাকুর যদি গাজলপুরে বাস করেন, ভালই। নইলে তোমার বরাত তোমাকেই পথ দেখিয়ে দেবে।

হঠাৎ সদর দরজায় খুট্ খুট্ শব্দ হইতে, দুইজনেই উৎকর্ণ হইয়াছিল। কিশোরী খুব আস্তে আস্তে জানালার পাশে বসিয়া পুনরায় শব্দ

হয় কিনা লক্ষ্য রাখিতেছিল, দেখিল—সৌরভী সদর দরজা খুলিয়া দিতেই বাহির হইতে জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি ভিতরে ঢুকিল। তারপর পার্শ্বের ছোট্ট দালানটুকুতে দাঁড়াইয়া দু'জনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি সব কথা হইল বোঝা গেল না।

রামী ও কিশোরী জানালার পাশ হইতে নড়িল না। কিন্তু এমন একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল যে, যাহাতে এইরূপ নীরব হইয়া বসিয়া থাকাটা দুজনের একজনেরও কর্ত্তব্য বিবেচিত হইল না। দুজনেই দেখিল—সৌরভী তাহার শয়নঘর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটি বাক্স বাহির করিয়া দিল, এবং লোকটি অপর এক মুটের মাথায় উক্ত বাক্স দুইটি চাপাইয়া দিয়াই, তাহাকে পলায়নের ইঙ্গিত করিলি। সৌরভী পুনরায় ঘরে ঢুকিল, অপরিচিত ব্যক্তিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

পশুপতি অন্য ঘরে ছিলেন। কিশোরী অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া পিতার গৃহ সম্মুখে আসিয়াই, দারুণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পশুপতির গৃহদ্বার বাহির হইতে তালাবদ্ধ।

অত্যন্ত বিস্ময়-ব্যাকুলচিত্তে কিশোরী ডাকিল—বাবা! বাবা!...

পশুপতির তরফ হইতে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া মিলিল না, কিন্তু সৌরভী নবাগত ব্যক্তিকে বাহির করিয়া দিয়া একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চাল চালিয়া বসিল। কিশোরীর চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে টানিতে, পশুপতির ঘরের খোলা জানালাটার পাশে লইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ও বামুনঠাকুর! ওগো! শীগ্‌গীর ওঠো!

পশুপতি ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। সৌরভী তখন কিশোরীকে একহাতে এবং রামীকে এক হাতে ধরিয়া চীৎকার করিতেছে

—ভদ্দর লোকের মেয়ে হ'য়ে তোদের এই কাজ?...বল্ হতভাগী, ঘরের চাবি কোথায় রেখেচিস বল!...ওঃ কি আমার ভালবাসার কন্তে গো! বাপ ব'লতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় অজ্ঞান হচ্ছিলেন!......এখন বুকে ব'সে দাড়ী তুল্‌তে চাও বটে!......সৌরভী বেঁচে থাক্‌তে তা হবে না।...ছোট-লোকের মেয়ে! চোর কোথাকার! চাবি দে শীগ্‌গীর!—বামুনকে ঘর থেকে বের করে তোর চাতুরীটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই।

গৃহমধ্যে থাকিয়াই পশুপতি বলিলেন—কি হয়েচে?—চীৎকার করছো কেন?

সৌরভী বলিল—হ'য়েচে তোমার সাত দুগুনে চৌষট্টিপুরুষের ছেরাদ্দ। তোমার আদরের রাজকন্তে আর তার এই ছোটলোক সখী, দুজনে যুক্তি করে, তোমাকে ঘরের ভেতর চাবি দিয়ে আট্‌কে রেখে, জিনিসপত্র নিয়ে সরে পড়ছিল। ভাগ্যিস্ আমার ঘুম ভেঙে গেল,... হাতে হাতে ধরে ফেলেচি।

ক্রুদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া পশুপতি হাঁকিলেন—দোর খোল শীগ্‌গীর! নইলে পুলিশে দেব।......

রামী অত্যন্ত ঘৃণার সহিত বলিল—ঐটুকুই শুধু বাকী আছে।

পশুপতি বলিলেন—তালাটা ভেঙে ফেলো সৌরভী।......বেটীকে খুন না করে আজ আর খালাস নেই আমার।

কিশোরীর মুখ দিয়া ছোটখাটো প্রতিবাদের শব্দও বাহির হইল না। যেন সে সহজেই অপরাধ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রামীও আর কথা কহিতে ইচ্ছা করিল না। ঘৃণা ও লজ্জায় তাহার সারা অঙ্গ জ্বলিয়া যাইতে-ছিল। সৌরভী বলিল—চল্ কোথায় চাবি রেখেচিস দেখাবি চল্!...বলিতে

বলিতে দুজনকেই ধাক্কা দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে, দরজার পাশে টানিয়া আনিল, তারপর নিজের আঁচল হইতে চাবি লইয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

পিঞ্জরাবদ্ধ নির্য্যাতীত সিংহ, পিঞ্জর হইতে ছাড়া পাইলে যেমন ভীষণ হিংস্র হইয়া উঠে, পশুপতি তেমনি ভাবেই ছুটিয়া আসিয়া কিশোরীকে আক্রমন করিলেন। পদাঘাতে কন্যাকে ভূতলশায়ী করিয়া, স্নেহময় পিতা এমন প্রবল প্রহার সুরু করিলেন যে, খানিকক্ষণ পরে ভীত হইয়া গৌরভীই বলিয়া উঠিল—ম'রে যাবে যে! খুনের দায়ে পড়তে হবে,আর কেন?ছাড়ো!

হঠাৎ রামী পশুপতির পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল,—খুন করতে আর বাকী রেখো না ঠাকুর! মেরে ফেলে আজ ওকে এ জন্মের মতন রেহাই দিয়ে দাও! বেচারী বড় জ্বালায় বড় কষ্টে তোমার কোলে আশ্রয় নিতে এসেছিল যে!...তাকে আজ মেরে ফেলে বাঁচার সুখটুকু লাভ করতে দাও। নইলে তোমারই অধর্ম্ম হবে।

পশুপতি রাগের মাথায় রামীকেও বাদ দিলেন না,—পদাঘাতে তিনচার হাত দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—কেলেঙ্কারী করার আর ঠাঁই পাওনি?......দূর হ'য়ে যা—পাজী নচ্ছার মাগী!......

রামী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—মেরে ফেল্লে গো! কে আছো রক্ষা করো!

কিশোরীর কপালের ক্ষত দিয়া দরদর ধারে রক্ত ছুটিতেছিল। বুকে পিঠে অসহ্য ব্যথা অনুভব করিয়া সে কোন রকমেই খাড়া হইবার শক্তি পাইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বড় আশায় সুখের আশ্রয় ছেড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম বাবা! আজ তার খুব শাস্তি লাভ হ'ল আমার!......আমি মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু রামীকে আর কষ্ট দিয়ো না বাবা! ওদের দয়াতেই আমার সব গিয়েও সর্ব্বস্ব যায় নি। জীবনের কোন

সাধই তো আমার মিট্‌লো না বাবা!...আজ শুধু এই সাধটি মিট্‌তে দাও! রামীকে মেরো না!......

পশুপতি রামীকে ছাড়িয়া দিয়া, কিশোরীকে বেদম্ প্রহার সুরু করিলেন। নির্য্যাতিতা চির অভাগিনী মুখ বুজিয়া সে প্রহার সহ্য করিল, তবু আর্ত্তনাদের শব্দ তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না।

সৌরভী মনে মনে প্রমাদ গণিল। পাছে নিজের হিত করিতে গিয়া, এ চাতুরীর খেলায় পুলিশের হাতে খুনী আসামী সাজিতে হয়—এই আশঙ্কায়, সে পশুপতিকে জোর করিয়াই থামাইয়া দিল।

রামী দেখিল—কিশোরীর জ্ঞান নাই! উদ্বেগ ও আশঙ্কায় সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—এ কাজ কেন করলে ঠাকুর! দোষ করলেও ও যে তোমার মেয়ে! সংসারে তোমা ছাড়া আপন বলতে ওর যে আর কেউ বেঁচে নেই! যতদিন মা বেঁচেছিল,—নিজে না খেয়ে, ওকে খাইয়ে-পরিয়ে বড় করেছিল, তোমার দোরে একদিনও দয়া চাইতে আসে নি। অভাগী মা হারিয়ে, বাপকেই সর্ব্বস্ব ভেবে,—তোমার পায়ের তলা সার করেছে আজ, তবু তোমার দয়া হয় না ঠাকুর! মায়াদয়া ব'লে কোন্ কিছুর সঙ্গেই কি তোমার পরিচয় নেই?

সৌরভী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল—ওমা!......গয়লার মেয়ের কথাগুলি তো বেজায় লম্বা লম্বা দেখ্‌চি। বলি কোন্ গাঁয়ের কোন্ টোলে বিদ্যে শিখেছিলে গো? পাশ ফাস্ দিয়েছ নাকি?

রামী চটিল না। জবাব দিল—তোমার সঙ্গে আমি কথা কইনি মা!......ছুটি পায়ে ধরি—তুমি এর মধ্যে কথা ব'লতে এসো না। বাপ-মেয়ের কথার মাঝখানে তোমার কথা বল্‌বার কেনো অধিকার নেই।

সৌরভী মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল—অধিকার আছে কিনা দেখ্‌বি? ছোটলোক মাগী!...গলায় হাতদিয়ে বাড়ী থেকে দূর করে দেব—জানিস?

রামীর তখন ঝগড়া করিবার সময় নহে। একান্ত মনোযোগ দিয়া সে কিশোরীর শুশ্রূষা করিতেছিল।...পশুপতিকে ডাকিয়া সৌরভী বলিল—ঘরে চলো!—ঠাণ্ডা হ'য়ে খানিক না ঘুমুলে কাল আবার মাথার অসুখ বেড়ে যাবে। বলিয়াই পশুপতির হাত ধরিয়া ঘরে ঢুকিল। এবং দরজাটাও ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিল।......

ভোর হইয়া গেছে। ধীরে ধীরে রামী আসিয়া বাহির হইতে ডাকিল খুড়োঠাকুর! কিশোরী তো বাঁচবে না আর! এখনো জ্ঞান হল না যে!...দয়া করে একবারটি—

সৌরভী বলিল—অজ্ঞান হ'লে তবে তো জ্ঞান হবে আবার? ওর হ'য়েচে কি?...ভণ্ডামী করে চোখ বুজে প'ড়ে রয়েচে। খুড়োঠাকুরের দেহ ভাল নয়—সে যেতে পারবে না।

কিন্তু পশুপতির বুকখানার কোন্ নিভৃততম স্থান হইতে বিবেকের ক্ষীণরশ্মি জাগিতেছিল।...হায়রে! যথাসর্ব্বস্ব যার একান্ত করতলগত—আজ সেই ই মৃত্যু-কবলিত হইতে বসিয়াছে—তবু তাঁর হিয়ার পরতে পরতে এতটুকু গ্লানির রেখাপাত হয় না! পশুপতি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সৌরভী জিজ্ঞাসা করিল—উঠ্‌ছো কেন?

পশুপতি বলিলেন—সত্যিসত্যিই বেঘোরে মরবে? গৌর ডাক্তারকে নিয়ে আসি।

সৌরভী বলিল—নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারতে যদি সাধ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে যাও!...খুন করেছ—একথা ডাক্তারেই সাক্ষী

দেবে।...সৌরভীর নিজের দিক দিয়াও ভীত হওয়ার প্রচুর কারণ ছিল, এবং সেই জন্যই সতর্ক করিতে লাগিল।

অন্তরের নিদারুণ ঘাত প্রতিঘাতে পশুপতি বড়ই দমিয়া গেলেন। মেয়ের প্রতি মমতা অপেক্ষা আপন প্রাণের ও ধনের মমতাই তাঁর বেশী বোধ হইল। আবার তিনি ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন।

রামী দোরের কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। সৌরভী বলিল—বেলা হ'লে, একটুখানি গরম দুধ এনে দেব। দু চার ঢোক্ পেটে পড়লেই সেরে যাবে। ভাবনা কিসের? কিছু হবেনা, যাও!

রামী টলিতে টলিতে আবার কিশোরীর কাছে ফিরিয়া আসিল। তাহার সংজ্ঞালুপ্ত দেহটা কোলে তুলিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিয়া অবিরল চোখের জল ফেলিতে লাগিল। অন্তরের মাঝে দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে কতই যে জমাট বাঁধা অশ্রু গোপন করা ছিল! আজ গলিয়া গলিয়া সংসার-তাপদগ্ধা কিশোরীর মূর্চ্ছিত মুখের উপর ঝরিতে লাগিল!—যে রামী, কিশোরীর মঙ্গল কামনায় উচ্চ রোলে একদিন জানাইতে পারিয়াছিল—গাঙ্গলপুর ধূ ধূ করে জ্ব'লবে,—আজ সেই রামীর মুখর কণ্ঠ কিশোরীকে মরণাপন্ন দেখিয়া মূক হইয়া গেছে!

পশুপতির তখন তন্দ্রা আসিয়াছে। কিন্তু সৌরভী চিন্তান্বিতা! ......সকাল হইয়া গেছে! অন্ধকার ঘরখানা আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। পাশ ফিরিয়া কিশোরী ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করিল—মা!

রামী তখন কিশোরীর কণ্ঠলগ্না। তাহার গলাটা জড়াইয়া একান্ত স্নেহের সুরে বলিল—দিদি আমার!...কেমন আছো দিদি...বলিয়াই রামী কাঁদিয়া ফেলিল।

কিশোরী রামীর বুকের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল—চিরকালটাই তোরা আমাকে কষ্ট দিলি গয়লা বউ!...আমার আগে যদি তোর মরণ হ'তো, আমি বাঁচতাম।...আমি ম'রে গেলে—তোর বুকেই যে বেশী বাজ্‌বে দিদি?...ওরে! এত ভাল তুই বেসেছিলি? তারপর কহিল—একটা দিব্যি কর রামী!...আমার মরণ কালের অনুরোধ।

রামীর কথা কহিবার শক্তি ছিলনা। তবু বলিল—ওকথা আর বলো না দিদিঠাক্‌রুণ!...আমার অতটুকু সহ্য করবার শক্তি নাই।

—তবু ব'ল্‌বো!...মিনতি করি দিদি!...আমি তো বাঁচ্‌বনা, কিন্তু ননদাকে বুঝিয়ে বলিস্;—আমি চলে গেলে, আমার বাবার উপর যেন তোরা সুবিচার করিস।...তাঁর মতন অভাগা দুনিয়ায় আর কেউ নেই রামী। রাক্ষসীর মায়া-মুক্ত হওয়ার সূচনাটুকু যেন আমার মৃত্যুই তাঁকে দেখিয়ে দিতে পারে।

রামী কহিল—কিন্তু তুমি যাকে সুবিচার ব'লছো দিদিঠাক্‌রুণ, সে তো সুবিচার নয়, অবিচার। কিন্তু ভাল হ'য়ে তুমিই একদিন সুবিচার কোরো ভাই!

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কিশোরী বলিল—আর ভাল হবো!...বুকের ক'ল্‌জেটা ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে গয়লাবউ!—সেখানে আর জীবনী-শক্তির ঠাঁই নেই।......

* * একবাটী গরম দুধ হাতে করিয়া সৌরভী ঘরে ঢুকিল। কিশোরীকে কথা কহিতে শুনিয়া, বলিল—কেমন আছিস মা?...তোর বাবাকে ডাক্তারের কাছে পাঠালাম।...এক্ষুনি সব সেরে যাবে। তার-পর রামীর হাতে দুধের বাটীটা দিয়া, বলিল—একটু একটু করে

নয়, একচুমুকে খাইয়ে দাও। গায়ে বল পাবে। ঐ বুঝি ডাক্তার এলো।

কিন্তু ডাক্তার আসার শব্দ নয়, আসিয়াছিল—নন্দলাল।

একচুমুকে দুধটুকু খাইয়া মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কিশোরী বলিল—একটা কথা ব'লবো রামী!—কারুকে ব'লবিনি তো? খুব গোপন কথা কিন্তু। আমার শেষ অনুরোধ ভাই!—

রামী বাঁ হাতে দুধের বাটীটা ধরিয়া, ডানহাতে কিশোরীর মুখখানা মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—বলো কি ব'লবে?

কিশোরী কহিল—কিন্তু শপথ কর্‌লি—কেউ যেন না শোনে!—

—আচ্ছা আচ্ছা কেউ শুন্‌বেনা—বলো।

—দুধের মধ্যে কিছু মিশিয়ে রেখেছিল। বড্ড তেঁতো লাগ্‌লো!... রামী ভীত অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিতেই কিশোরী বলিয়া উঠিল—কিন্তু শপথ করেছিস রামী! আমার বাবাকে বাঁচিয়ে দে! আমি তো গেলামই, বাবা যেন না যায়! একের জীবনে অন্যের জীবন নিয়ে কোন ফল হয় না ভাই! পরকালের জবাব তো তুই-আমি দিতে যাবোনা রামী। ওকেই তা দিতে হবে।...কিন্তু বুকখানার মাঝে অসহ্য জ্বালা! জ্ব'লে গেল গয়লাবউ!...বেশীক্ষণ আর কথা কইতে পারবো না।—আবার ব'লে-রাখচি—আমার বাবা রইলো!—বড় অভাগা—বড় দুঃখী বাবা আমার। তাকে তোরা সকল দিক থেকে রক্ষা করিস।

কিশোরীর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। এমনি সময় নন্দলাল ও সিধুঠাকুর ঘরে ঢুকিল। নন্দলাল উচ্চ রোদনে বাড়ী মুখরিত করিয়া বলিল—তোর কপালে এত কষ্টও লেখা ছিল কিশোরী

দিদি!...বাপের কাছে আস্‌তে যে লক্ষবার তোকে বারণ করেছিলাম—তবু—

ইঙ্গিতে কিশোরী, নন্দলালকে নীরব হইতে বলিল। পশুপতি আসিয়া বলিলেন—ডাক্তারকে তো পাওয়া গেলনা!...ঘণ্টাখানেক পরে আসবে।

কিশোরী সিধুঠাকুরের পদধূলির জন্ত হাত বাড়াইল। সিধু কাছে আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—হঠাৎ কি হ'ল দিদি?...আমি যে তোকে বাপের কাছে সুখী হ'য়ে থাক্‌বার ব্যবস্থা করতে এসেছিলাম।

ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠে কিশোরী বলিল—বাবাকে তোমরা ভাল বেসো দাদামশায়!—বাবা আমার ছুনিয়ায় ভাল বাসার কাঙাল! তারপর পশুপতির ছুটি পায়ের কাছে হাত রাখিয়া বলিল—বাবা! বাবা! একবার বলো—এখনো কি আমাকে ভাল বাস না বাবা?

পশুপতি রুদ্ধ আবেগে ফুঁপাইতে লাগিলেন।

নন্দলাল চীৎকার করিয়া উঠিল—আমি কারুর কথা শুন্‌বোনা, যে আমার দিদির এ দশা করলে, তাকে চিবিয়ে খাবো।

কিশোরীর তখন জ্ঞান নাই!

রামী ডাকিল—দিদিঠাক্‌রুণ!—ভাই! কথা কও,—চেয়ে দেখো—যাদের জন্তে জলে পুড়ে ম'রেছ,—আজ তারাই তোমাকে সুখী করতে, এসেচে যে!—কথা কও দিদি আমার!

কিন্তু এ ছুনিয়ার দেনা-পাওনা চুকাইয়া, কিশোরী তখন খেয়ার তরীতে চাপিয়া বসিয়াছে! বিষ-জর্জ্জরিত দেহখানা তার নিসাড় নিস্তব্ধ!

রন্ধনশালা। ১·

কিশোরীকে পান করাইবার জন্য সৌরভী, দুগ্ধের সহিত বিষ মিশ্রিত

নন্দলাল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল—দিদিরে! এরা তোকে এক রাত্তিরে খুন করে ফেল্লে!...তারপর সহসা শুষ্ক কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—আমি থানায় যাবো।...নালিশ করবো—

হাত বাড়াইয়া রামমণি বলিল—থামো ছোড়দা! কিশোরীর আত্মাটা এখনো হয়তো বাড়ী ছেড়ে পালায় নি! তার মরণকালের অনুরোধ—চুপ করো!...

পশুপতি ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেই, কিশোরীর মরণাহত মুখখানার পানে চাহিয়া রামী বলিল—খুড়োঠাকুর! আজ থেকে আমিই তোমার কিশোরী!... এই অনুরোধ সে আমায় করে গেল আজ!...সে যে আমায় বোঝা বইতে রেখে গেছে বাবা!...

.........সৌরভী কোন্ ফাঁকে বাড়ী হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল কেহই টের পায় নাই।

শেষ

কিশোরীর পরেই আমাদের আরো কি কি বই বাহির

হইয়াছে দেখুন—

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

—সুরমা—

দরিদ্রের করুণ ক্রন্দন যাঁহার লেখনী মুখে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়াছে—সেই নারায়ণ চন্দ্রের কপোলকল্পিত সমাজ সমস্যামূলক বিচিত্র উপন্যাস—**সুরমা**। প্রতি ছত্রে ছত্রে কারুণ্যের উষ্ণ প্রস্রবন ছুটিয়া যাইবে, পাঠক হৃদয়ে নব নব ভাবতরঙ্গের মত্ততা আসিবে। ভাগ্যলাঞ্ছিতা সুরমার মনোবীণার ছিন্নতারে যখন ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কার উঠে, জগতে এমন পাষাণহৃদয় কেউ নাই, যাহার নয়ন অশ্রুকুহেলীতে ঝাপ্‌সা না হইয়া থাকে।

নারায়ণচন্দ্রের আখ্যানভাগের ভাষা ও ঘটনা সংস্থাপনের নূতন পরিচয় কোন বাঙালী পাঠককেই জানাইয়া দিতে হইবে না। **নারায়ণচন্দ্রের** এই

সুরমার তুলনা—সুরমাই

সুরমা সাধ্বী মমতাময়ী,—অসীম ধৈর্য্যশালিনী !

সুরমা বিপদে স্থির ধীর গম্ভীর কঠোর ব্রতচারিণী !

সুরমা পাষাণী—সুরমা কল্যাণী—সুরমা মানিনী !

(এক সপ্তাহ পরেই বাহির হইতেছে)

২১।১ শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

বিখ্যাত নাটক—মিসরকুমারী রচয়িতা, স্বনামখ্যাত লেখক

২০। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত প্রণীত—

"বড়ঘরের মেয়ে"—১৲

"আমার নয়ন কোণে কালো কাজলের রেখা—

ধুয়ে যায় নয়ন জলে,

নিতি আসে নিশিথিনী ঘুমের পসরা ল'য়ে

নিতি ফিরে যায় বিফলে।"

—এই গানও বরদাবাবুর,—"বড়ঘরের মেয়ে"ও বরদাবাবুর।—গানের সঙ্গে বইয়ের অবিকল সামঞ্জস্য আছে।...একই পিতৃ-পিতামহের বংশসম্ভূত হইয়া, একই রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করিয়া, একের প্রতি অন্যের যে নিদারুণ কর্ত্তব্য আছে, এবং তাহা এই পৃথিবীতেই দেখাইতে হয়,—'বড়ঘরের মেয়ে'তে এ কথার তীব্র সমালোচনা ও জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে। ইহা দুইটি চির দুঃখী হৃদয়ের মিলনাশার ব্যাকুলতা আঁকা,—একটি মহিমময়ী সাধ্বীর অন্তর্নিহিত ব্যথা ও জমাট-বাঁধা অশ্রুর প্রবাহ!—বড় সুন্দর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী!